POSTAL REG NO GDP- 43 / 2020 -2022

আল্লাহ্‌র বাণী

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أَنَّ لَهُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (سورة المائدة:37)

নিশ্চয় যাহারা অস্বীকার করিয়াছে, জগতে যাহা কিছু আছে যদি উহা সবই এবং তৎসঙ্গে উহার সমতুল্য আরও তাহাদের নিকট থাকিত যাহাতে তাহারা কিয়ামতের দিন আযাব হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য উহা মুক্তি-পণ স্বরূপ দিতে পারিত, তবু উহা তাহাদের নিকট হইতে কবুল করা হইত না; বস্তুতঃ তাহাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক আযাব রহিয়াছে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْد
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

খণ্ড 6
গ্রাহক চাঁদা
বাৎসরিক ৫৭৫ টাকা

বদর
সাপ্তাহিক কাদিয়ান
Weekly BADAR Qadian Bangla

সংখ্যা 27
সম্পাদক: তাহের আহমদ মুনির
সহ-সম্পাদক: মির্যা সফিউল আলাম

www.akhbarbadarqadian.in

8 জুলাই, 2021 ● 27 যুল কাআদা 1442 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য, দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর নিরাপত্তার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হন। আমীন।

রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর বাণী

১৩৫১) হযরত আনাস বিন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে লোকেরা একটি জানাযার পাশ দিয়ে অতিক্রান্ত হল। তারা মৃত ব্যক্তির প্রশংসা করলে রসুলুল্লাহ (সা.)বললেনঃ আবশ্যিক হয়ে গেল। এরপর তারা অপর একটি মৃতদেহের পাশ দিয়ে অতিক্রান্ত হল। তারা মৃতব্যক্তির নিন্দা করল। [নবী (সা.) বললেন:] আবশ্যিক হয়ে গেল। হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.) বললেনঃ কি জিনিস আবশ্যিক হয়ে গেল? রসুলুল্লাহ্ (সা.) বললেনঃ তোমরা যার প্রশংসা করলে, তার জন্য জান্নাত অনিবার্য হয়ে গেল আর তোমরা যার নিন্দা করলে তার জন্য আগুন অনিবার্য হয়ে গেল। তোমরা পৃথিবীতে আল্লাহ্ তা'লার সাক্ষী।

১৩৬৮) আবুল আসওয়াদ থেকে বর্ণিত আছে, ' আমি মদীনায় আসি, যখন কি না সেখানে রোগ ছড়িয়ে পড়েছিল। আমি হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.)-এর কাছে বসে ছিলাম। এমতাবস্থায় এক ব্যক্তির জানাযা অতিক্রান্ত হলে লোকেরা তার প্রশংসা করল। হযরত উমর (রা.) বললেনঃ অনিবার্য হলে গেল'। আরও একজনের জানাযা অতিক্রান্ত হলে তারও প্রশংসা করা হয়। হযরত উমর (রা.) বললেনঃ অনিবার্য হয়ে গেল। তৃতীয় এক ব্যক্তির জানাযা অতিক্রান্ত হলে তার নিন্দা করা হয়। (হযরত উমর) বললেনঃ অনিবার্য হয়ে গেল।' আবুল আসওয়াদ বলেনঃ 'আমি বললামঃ হে আমীরুল মোমেনীন! কি জিনিস অনিবার্য হলে গেল?' তিনি উত্তর দিলেনঃ 'আমি সেকথাই বলেছি যা নবী (সা.) বলেছিলেন। যে মুসলমানের পক্ষে চারজন ব্যক্তি প্রশংসাসূচক সাক্ষ্য দেয়, আল্লাহ্ তাকে জান্নাতে প্রবিষ্ট করবেন।' আমি বললামঃ 'যদি তিনজন সাক্ষ্য দেয়? তিনি বললেনঃ তিনজন হলেও।' আমরা বললামঃ যদি দুইজন সাক্ষ্য দেয়?' তিনি বললেনঃ দুইজন হলেও। 'অতঃপর আমরা তাঁকে একজন সাক্ষীর বিষয়ে জিজ্ঞাসা করি নি।'

(সহী বুখারী, ২য় খণ্ড)

আঁ হযরত (সা.) এর সঙ্গীরা সততা ও বিশ্বস্ততার এমন দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করলেন, যার নজির পৃথিবীর ইতিহাসে পাওয়া যাবে না।
আমি দেখছি যে আল্লাহ্ তা'লা আমার জামাতকেও সেই মর্যাদা ও প্রতিষ্ঠা অনুসারে এক প্রকার আবেগ ও উচ্ছ্বাস দান।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

নিষ্ঠাবান ও বিশ্বস্তদের একটি জামাত

আমাকে বিশ্বস্ত ও নিষ্ঠাবানদের এক জামাত দান করার জন্য আমি আল্লাহ্ তা'লার কাছে কৃতজ্ঞ। আমি দেখেছি যে যখনই কোন কাজ বা উদ্দেশ্যে তাদেরকে আহ্বান করেছি, তারা ক্ষিপ্রতার সঙ্গে আবেগ নিয়ে নিজের নিজের শক্তি ও সামর্থ নিয়ে এগিয়ে এসেছে, একে অপরকে ছাপিয়ে যাওয়ার উদগ্রতায়। আমি তাদের মধ্যে এক প্রকার সততা ও নিষ্ঠা প্রত্যক্ষ করেছি। আমার পক্ষ থেকে কোন নির্দেশের ইঙ্গিত পেতেই তা পালনে তারা তৎপর হয়ে ওঠে। বস্তুত, কোন জাতিই প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা নিজেদের নেতাদের আনুগত্য ও অনুসরণের ক্ষেত্রে এই পর্যায়ের নিষ্ঠা ও আবেগের স্পৃহা লালন করে। যে কারণে হযরত মসীহ (আ.) কে বিপদাপদ ও দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছিল, তাঁর অনুগামীদের দুর্বলতা ও আন্তরিকতার অভাবও এর মধ্যে অন্যতম ছিল। যেমন- হযরত মসীহকে যখন গ্রেপ্তার করা হল, তখন পিটার-এর ন্যায় প্রথম সারির শিষ্যও তাঁর প্রভুত্ব ও পথপ্রদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করল; এমনকি সে তাঁর প্রতি তিনবার অভিসম্পাত করল, তাঁর অধিকাংশ শিষ্যও তাঁকে ত্যাগ করে পলায়ন করল। এর বিপরীতে আঁ হযরত (সা.) এর সঙ্গীরা সততা ও বিশ্বস্ততার এমন দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করলেন, যার নজির পৃথিবীর ইতিহাসে পাওয়া যাবে না। আঁ হযরত (সা.)-এর কারণে তাঁরা হাসি মুখে সকল প্রকারের যন্ত্রনা সহন করেছেন। এমনকি তাঁরা নিজেদের প্রিয় মাতৃভূমি ত্যাগ করেছেন, ধন-সম্পদ, সহায়-সম্বল ও বন্ধু-বান্ধবদের ত্যাগ করেছেন। অবশেষে তাঁরা আঁ হযরত (সা.)-এর কারণে নিজেদের প্রাণ ত্যাগ করতেও কুণ্ঠিত হন নি, পরিতাপ করেন নি। এই সততা ও বিশ্বস্ততাই পরিশেষে তাঁদেরকে সফলকাম করেছে। অনুরূপভাবে আমি দেখছি যে আল্লাহ্ তা'লা আমার জামাতকেও সেই মর্যাদা ও প্রতিষ্ঠা অনুসারে এক প্রকার আবেগ ও উচ্ছ্বাস দান করেছেন আর তারা সততা ও বিশ্বস্ততা প্রদর্শনের ক্ষেত্রে দৃষ্টান্ত হয়ে উঠেছে। যেদিন থেকে আমি নাসিবাইন-এ একটি প্রতিনিধি দল প্রেরণ করতে মনঃস্থির করেছি, প্রত্যেক ব্যক্তির বাসনা, তাকে যেন এই কাজের জন্য নিযুক্ত করা হয় আর যাদেরকে এর জন্য নির্বাচন করা হয়েছে, সকলে তাদেরকে ঈর্ষার দৃষ্টিতে দেখে। তাদের বাসনা, এই জায়গা তাদেরকে নিযুক্ত করলে পরম সৌভাগ্য প্রাপ্তি ঘটত। অনেকেই এই অভিযানে যাওয়ার জন্য নিজেকে উৎসর্গ করেছে। আমি এই সব আবেদনগুলি আসার পূর্বেই মির্যা খোদা বখশ সাহেবকে এই অভিযানের জন্য নির্বাচিত করে ফেলেছিলাম। তাঁর সঙ্গে মৌলবী কুতুবুদ্দীন এবং মিঞা জামালুদ্দীনকে পাঠানোর জন্য নির্বাচিত করে রেখেছিলাম। এই কারণে আমাকে এই সব আবেদনগুলিকে নাকচ করতে হয়েছে। তথাপি আমি জানি, যারা নিজেদেরকে এই কাজের জন্য পূর্ণ বিশ্বস্ততা এবং সততার সাথে উপস্থাপন করেছিল, তারা নিজেদের সৎ সংকল্পের দরুন আল্লাহ্ তা'লার প্রতিদান থেকে বঞ্চিত হবে না, তারা নিজের নিজের নিষ্ঠা অনুসারে পুরস্কার ও প্রতিদান লাভ করবে।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৩০৬-৩০৭)

হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.)-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক-নির্দেশনা

কনের বাড়ীতে বিবাহ ভোজ সম্পর্কে হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন, 'যদি মেয়ে পক্ষের সাধ্য ও সামর্থ থাকে তাহলে সীমিত গন্ডিতে ব্যবস্থা করা যেতে পারে। ঋণ করে অন্যের দেখা-দেখি কখনও বড় ভোজের ব্যবস্থা করা উচিত নয়। সবকাজে তরবিয়তের দিকটা সামনে রাখা চাই। যাদের আর্থিক সামর্থ নেই তাদের কোনভাবেই হীনমন্যতায় ভোগা উচিত নয়।'

* ফটো সম্পর্কে হুযুর (আই.) বলেন, বিয়ের জন্য যদি ফটো দিতে হয় দিন কিন্তু তার পরে ফেরত নিতে হবে। পত্রিকায় কোন আহমদী মহিলার ছবি ছাপা ঠিক হবে না।

সূত্র: পাক্ষিক আহমদীয়া, ৩১ শে জুলাই, ২০১৩

এই সংখ্যায়

খুতবা জুমা, প্রদত্ত, ৪ জুন ,২০২১
হুযুর আনোয়ার (আই.) সফর বৃত্তান্ত
জার্মানী, ২০১৪ (জুন)

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

২০১৪ (জুন) সালে সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-এর জার্মান সফর

৮ জুন, ২০১৪ (অবশিষ্ট রিপোর্ট)

এরপর ফ্রেইসিং জেলার প্রধান মি. জোসেফ হাউনার নিজের বক্তব্যে বলেন–

'সম্মানীয় খলীফাতুল মসীহ! এটি আমার জন্য অত্যন্ত আনন্দের বিষয় যে আজ আমাদের মাঝে খলীফাতুল মসীহ রয়েছেন। আপনি এখানে এসেছেন বলে আপনাকে ধন্যবাদ।

জামাত আহমদীয়ার আদর্শবাণী 'ভালবাসা সকলের তরে, ঘৃণা নয়কো কারো পরে' দীর্ঘদিন থেকে মসজিদে ঝুলে আছে। ১১ই সেপ্টেম্বরের ঘটনার পর আপনারা হাতে লিখে এটি লাগিয়েছিলেন। আপনারা এখানে শান্তিপূর্ণভাবে থাকার চেষ্টা করেন। আপনাদের এই প্রচেষ্টাকে আমি প্রশংসার দৃষ্টিতে দেখি। আপনাদের জামাত দুশটির বেশি দেশে প্রতিষ্ঠিত আছে আর সর্বত্র শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য সচেষ্ট আছেন।

আপনারা সর্বত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করেছেন। আর এই প্রদেশেও আপনারা নিজেদের গঠনমূলক ভূমিকা পালন করছেন। আজ আমরা সকলে মিলে আপনাদের মসজিদের উদ্বোধন করছি, এই দৃষ্টিকোণ থেকে এটি অনেক বড় ও গুরুত্বপূর্ণ দিন। আমি ভীষণ আনন্দিত আর আপনাদেরকে সাধুবাদ জানাই। বেশ প্রশস্ত, খুব সুন্দর মসজিদ তৈরী হয়েছে। আপনাদের এখানে গোটা জামাত একসঙ্গে কাজ করেছে। আমি আপনাদের এই সেবামূলক কর্মকাণ্ডকে সমাদরের দৃষ্টিতে দেখি। আর দোয়া করি যেন আপনারা এই মসজিদে এমন দোয়া করবেন যা শান্তি প্রতিষ্ঠার কারণ হবে আর আমরা সকলে শান্তিপূর্ণভাবে নিজেদের জীবন অতিবাহিত করতে পারব।

এরপর শহরের প্রাক্তন মেয়র মি. রেইনরা স্লেইডার নিজের বক্তব্য প্রদান করেন।

তিনি বলেন, সম্মানীয় খলীফাতুল মসীহ! সর্ব প্রথম আমি খলীফাতুল মসীহকে এখানে আসার জন্য ধন্যবাদ জানাই। আজকের দিনটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শুধু জামাতের দৃষ্টিকোণ থেকেই নয়, শহরের জন্যও। আমি আনন্দিত যে আজকের এই অনুষ্ঠানে এত বিপুল সংখ্যক মানুষ উপস্থিত হয়েছেন। সকলেই আনন্দিত আর একথা ব্যক্ত করছে যে আমরা একসঙ্গে মিলে মিশে থাকি।

১৯৯০ সালে আপনাদের সঙ্গে প্রথম যোগাযোগ হয়। আমি আপনাদের সম্পর্কে অনবগত ছিলাম। খুব কম সময়ের মধ্যেই আপনাদের বিষয়ে জেনেছি যে আপনারা শান্তিপূর্ণ জীবনযাপনে বিশ্বাসী, অপরের দিকে সহায়তার হাত বাড়িয়ে দেন এবং মানুষের সেবা করেন।

আপনাদের বৈশিষ্টের কারণেই আপনাদের এখানে মসজিদ তৈরী করা এবং সেই সঙ্গে মিনার তৈরী করাও আপনাদের জন্য সহজ হয়ে গিয়েছে। আমরা প্রতিবেশিদের সঙ্গে কথা বলেছি যার পরিণামে আপনাদের এই মসজিদ তৈরী হল।

আপনাদের মসজিদের মিনার হল শান্তির প্রতীক। মসজিদটি কেবল আপনাদের জন্যই খোলা নয়, Neufahrn শহরবাসীর জন্যও উন্মুক্ত। আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আপনারা আমাদের সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠাকারী এবং আমরা ঐক্যবদ্ধ রয়েছি।

আজ মসজিদুল মাহদীর উদ্বোধন অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে আমি একথাই বলব যে, একে অপরের সঙ্গে সমন্বিত হোন, অপরকে স্বীকার করুন এবং মিলেমিশে জীবন অতিবাহিত করুন।

এরপর ফ্রেইসিং জেলা প্রশাসনের সভাপতি মি. হেনয গ্রুনওয়াল্ড তাঁর বক্তব্যে বলেন, ' সম্মানীয় খলীফাতুল মসীহ! আমি আহমদীয়া মুসলিম জামাতকে বিগত কুড়ি বছর থেকে চিনি, যখন বায়ার্ন সরকারে বিদেশি নাগরিকদের জন্য কাজ করতাম। আমি জানি যে আহমদীয়া মুসলমানদের চরিত্র অন্যান্য সংগঠনের থেকে একেবারেই আলাদা। আমি জামাতকে সব সময় সম্মানের দৃষ্টিতে দেখে এসেছি। ইন্টিগ্রেশন সম্পর্কে আমরা এখনও অনেক কাজ কাজ করতে পারি। আমি জানি এটা কতটা কঠিন কাজ। আমি একথা বলছি না যে আপনারা একেবারে আমাদের মত হয়ে যাবেন– আপনাদের জামাত একেবারে উন্মুক্ত জামাত। আপনারা সকলের সঙ্গে মিলে জীবন অতিবাহিত করেন। আপনাদের সঙ্গে অনায়াসেই কথা বলা যায়। জার্মানীতে আপনাদের ৩৫ হাজারের অধিক সদস্য আছে। আমি দোয়া করি, ভবিষ্যতে আপনারা আরও বেশি ফুলে ফলে সুশোভিত হউন।

এরপর ফ্রেইসিং শহরের লর্ড মেয়র নিজের বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন, 'সম্মানীয় খলীফাতুল মসীহ! আমি আনন্দিত যে আপনি আমাদের মাঝে রয়েছেন। ..... শহরের পক্ষ থেকে আপনাকে সাধুবাদ জানাই। এই মসজিদটি Neufahrn এলাকাতেই নয়, আমাদের এলাকার মধ্যেও পড়ে, আমাদের সেখানকার মানুষও এখানে আসবে।

মানুষ যখন একে অপরকে চেনে না, পরস্পরের সম্পর্কে ভীত থাকে, তখন পারস্পরিক আলোচনা ও কথোপথনের মাধ্যমেই সমস্যার সমাধান হয়। আপনারা নিজেদের ধর্মের বিষয়ে কোন রাখঢাক রাখেন না, নিজেদের পক্ষ থেকে শান্তির বার্তা পৌঁছে দেন, শহরে বৃক্ষরোপন করেন,সাফাই অভিযান করেন– এগুলি থেকে বোঝা যায় আপনারা মানুষের সেবা করতে চান এবং মিলেমিশে থাকতে চান।

নতুন মসজিদের জন্য আমি আপনাদেরকে শুভেচ্ছা জানাই। খোদার কৃপা আপনাদের সঙ্গে থাকুক। খোদার নিরাপত্তা আপনাদের সঙ্গে থাকুক।

এরপর জার্মানীর ন্যাশনাল পার্লামেন্টের সদস্য মি. এরিচ ইস্টোফার বলেন, 'সম্মানীয় খলীফাতুল মসীহ! আজকের এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার জন্য আমি আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ জানাই। আপনারা খুব সুন্দরভাবে অভ্যর্থনা জানিয়েছেন। আপনাদের জামাত বিগত ৯০ বছর থেকে এখানে জার্মানীতে কাজ করছে। বর্তমানে জার্মানীতে আপনাদের ২২৫টি জামাত রয়েছে। আমি বিগত ৩০বছর থেকে বায়ার্ন প্রদেশে রয়েছি। আপনারা এই প্রদেশের মানুষের হৃদয়ে স্থান করে নিয়েছেন। আপনারা সেই টাইও বেঁধেছেন যা বিশেষ করে এই প্রদেশের লোকেরাই ব্যবহার করে। এতে আমি আনন্দিত। আমরা কেবল কথার জোরে বেঁচে থাকব না, পরস্পরের বন্ধুত্বকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। আমরা গর্বিত যে এই মসজিদটি আমাদের প্রদেশে রয়েছে। আপনারা এখানে শান্তিপূর্ণ ভাবে থাকুন। আপনি আপনাদের জন্য খোদার কৃপা ও নিরাপত্তা কামনা করি।

এরপর জাতিসংঘের সাম্মানিক শান্তিদূত প্রফেসর হেইনার বেইলফেড তাঁর বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন,' আজকের এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে আমি আনন্দিত। ধর্মীয় স্বাধীনতা সংক্রান্ত সংগঠনের একজন সদস্য হিসেবে আমি অকপটে একথা স্বীকার করছি যে, আজ পৃথিবীতে সব থেকে বেশি যারা নির্যাতিত তারা হল জামাত আহমদীয়ার সদস্য। আমাদের কোনও অনুষ্ঠানই জামাতের উল্লেখ ব্যতিরেকে সম্পূর্ণ হয় না। পাকিস্তান ছাড়া অন্যান্য দেশেও উৎপীড়ন চলছে। কাযাকিস্তানেও জামাতকে বহু সমস্যা ও কষ্টের সম্মুখীন হতে হচ্ছে।

আহমদীয়া মুসলিম জামাত অনেক সফলতা অর্জন করছে। ধর্মীয় স্বাধীনতার বিষয়ে তারা অনেক চেষ্টা করেছে। ইউরোপিয়ান পার্লামেন্টে আপনি যে সফলতা অর্জন করেছেন তা অনেক উপকারে এসেছে। অভিবাসনের ক্ষেত্রে আপনাদের চেষ্টা প্রশংসনীয়। আর এই সফলতা শরণার্থী হিসেবে আবেদনকারীদের কাজে আসবে। যারা নিজেদের ধর্ম গোপন রাখতে বাধ্য হয় তাদের অবশ্যই আশ্রয় পাওয়া উচিত। কাজেই এই জামাত এই কাজটি করে দেখিয়েছে।

জাতিসংঘের মানবাধিকার আইন সংক্রান্ত ধারার একটি অনুচ্ছেদে ধর্ম পরিবর্তনের অনুমতির কথা বলা হয়েছে।

স্যর যাফরুল্লাহ্ খান সাহেব যখন পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন, সেই সময় পাকিস্তানে ধর্মীয় স্বাধীনতা বজায় ছিল। বর্তমানে পাকিস্তানের শাসনক্ষমতা স্বৈরাচারী ও চরমপন্থীদের হাতে চলে গিয়েছে বলে মনে হয়।

সিরালিওনে আমি জামাতের স্কুল দেখেছি। জামাত সেখানে অভাবপীড়িত মানুষের সেবা করছে।

পাকিস্তানে আপনাদের বিরোধিতা হয়। এটি দুঃখের বিষয়, কিন্তু আপনাদের জন্য আনন্দের মুহূর্তও আসে। যেমন আজকে এই মসজিদের উদ্বোধন হচ্ছে। এছাড়াও আরও অনেক উপলক্ষ্য তৈরী হয়।

হুযুর আনোয়ার (আই.)–এর ভাষণ

তাশাহুদ এবং তাউযের পর হুযুর আনোয়ার বলেন–

সর্বপ্রথম আমি আপনাদের সকল অতিথিবৃন্দকে ধন্যবাদ জানাই যাঁরা আমাদের এই মসজিদ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছেন।

(এরপর ১০ পাতায়..)

জুমআর খুতবা

আজ রাতে এমন একটি সূরা আমার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে যা আমার কাছে পৃথিবীর সকল জিনিসের চেয়ে প্রিয

এরপর তিনি (সা.) সূরা ফাতাহ্'র আয়াত তিলাওয়াত করেন। হযরত উমর (রা.) নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! এই সন্ধি কি সত্যিই ইসলামের বিজয়? তিনি (সা.) বলেন, নিঃসন্দেহে এটি আমাদের বিজয়।

আঁ হযরত (সা.)-এর মহা মর্যাদাবান সাহাবী দ্বিতীয় খলীফায়ে রাশেদ ফারুক আযাম হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.)-এর পবিত্র জীবনালেখ্য।

হুদায়বিয়া নামক স্থানে মুসলমান ও কুরায়েশদের মাঝে যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় তাতে হযরত উমর (রা.)-এরও স্বাক্ষর ছিল।

বনু মুসতালিকের যুদ্ধের দিন নামায 'কাযা' হওয়ার বিষয়ে হাদীসের পর্যালোচনা। পাঁচজন প্রয়াত ব্যক্তির স্মৃতিচারণ ও জানাযা গায়েব। তারা হলেন- মাননীয় মহম্ম ইউসুফ সাহেব (সাবেক ইনচার্জ, দ্রুত লিখন বিভাগ, রাবোয়া), মাননীয় শোয়েব আহমদ সাহেব (ওয়াকফে জিন্দগী, কাদিয়ান), মাননীয় মকসুদ ভাট্টী সাহেব (মুবাল্লিগ সিলসিলা, কাদিয়ান), মাননীয় জাভেদ ইকবাল সাহেব (ফয়সালাবাদ) এবং ঘানার মুরুব্বী নওয়ায আহমদ সাহেবের সহধর্মিণী মানীয় মাদিহা নওয়াজ সাহেবা।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক মসজিদে মুবারক, টিলফোর্ড, প্রদত্ত ৪ জুন, ২০২১, এর জুমুআর খুতবা (৪ এহসান, ১৪০০ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.)বলেন: বিগত খুতবাগুলোতে হযরত উমর (রা.)'র স্মৃতিচারণ হচ্ছিল এবং বিভিন্ন যুদ্ধ ও অভিযানের (কথা) বর্ণনা করা হয়েছিল। 'হামরাউল আসাদ' এর যুদ্ধ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, উহুদের যুদ্ধের পর মহানবী (সা.) মদিনায় ফিরে আসেন আর কাফিররা মক্কার পথে যাত্রা করে; কিন্তু কুরায়েশদের পুনরায় আক্রমণের সংবাদ পেলে তিনি (সা.) সাহাবীদের সঙ্গে নিয়ে 'হামরাউল আসাদ' (নামক) স্থান পর্যন্ত যান। 'হামরাউল আসাদ'মদিনা থেকে আট মাইল দূরত্বে অবস্থিত একটি জায়গার নাম।

এই যুদ্ধাভিযান সম্পর্কে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) যা লিপিবদ্ধ করেছেন তা থেকে কিছুটা বর্ণনা তুলে ধরছি। কুরায়েশ বাহিনী বাহ্যত মক্কার পথে যাত্রা করেছিল, তবে এই আশঙ্কাও ছিল যে, তাদের এই কাজ মুসলমানদের উদাসীন করার উদ্দেশ্যে হতে পারে। আর এ শঙ্কা ছিল যে, পাছে তারা ফিরে এসে অতর্কিতে মদিনার ওপর আক্রমণ না করে বসে। এজন্য সে রাতে মদিনায় পাহারার ব্যবস্থা করা হয়, আর বিশেষভাবে সাহাবীরা সারা রাত মহানবী (সা.)-এর বাড়ি পাহারা দেন। প্রত্যুষে জানা যায় এই আশংকা নিতান্ত অমূলক ছিল না, কেননা ফজরের নামাযের পূর্বে মহানবী (সা.) এই সংবাদ লাভ করেন যে, কুরায়েশ বাহিনী মদিনা থেকে কয়েক মাইল দূরে গিয়ে থেমে গিয়েছে আর কুরায়েশ নেতাদের মধ্যে এই বিতর্ক চলছে যে, এই বিজয়ের সুযোগ কাজে লাগিয়ে মদিনায় আক্রমণ করে বসলে কেমন হয়! আর কোন কোন কুরায়েশ পরস্পরকে ভর্ৎসনা করছে যে, তোমরা মুহাম্মদ (সা.)-কে হত্যাও কর নি আর মুসলমান নারীদের দাসীও বানাতে পার নি, আর তাদের ধন-সম্পদও করায়ত্ত করতে পারো নি। বরং তোমরা যখন তাদের ওপর জয়যুক্ত হয়েছ আর তাদেরকে নিশ্চিহ্ন বা নির্মূল করার সুযোগ লাভ করেছ, তখনও তাদেরকে এমনিতেই ছেড়ে দিয়ে ফিরে এসেছ যাতে তারা পুনরায় শক্তি অর্জন করতে পারে। তাই এখনও সুযোগ আছে, ফিরে চলো আর মদিনার ওপর আক্রমণ করে মুসলমানদের সমূলে উৎপাটিত করো। আরেক দল বলছিল, যা কিছু ঘটেছে একে পুরস্কার জ্ঞান কর এবং মক্কায় ফিরে চল; পাছে এমন না হয় যে, যুদ্ধ জয়ের ফলে সামান্য যে খ্যাতি লাভ হয়েছে তাও আবার হাত ছাড়া হয়ে যায়, আর এই বিজয় পরাজয়ে রূপ নেয়। কিন্তু অবশেষে অত্যুৎসাহী লোকদের মতামত প্রাধান্য পায় আর কুরায়েশরা মদিনা অভিমুখে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়। মহানবী (সা.) যখন এই ঘটনার সংবাদ পান তখন তিনি তৎক্ষণাৎ ঘোষণা করেন যেন মুসলমানরা প্রস্তুত হয়ে যায়; কিন্তু পাশাপাশি এই নির্দেশও প্রদান করেন- যারা উহুদের যুদ্ধে যোগদান করেছিল তারা ছাড়া অন্য কেউ আমাদের সাথে যেন না যায়।

(মুজামুল বালদান, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩৪৬)(সীরাত খাতামান্নাবীঈন, পৃ: ৫০৪-৫০৫)

একস্থলে এটিও বর্ণনায় এসেছে যে, কুরায়েশদের এই ষড়যন্ত্র সম্পর্কে যখন মহানবী (সা.) জ্ঞাত হন তখন তিনি হযরত আবু বকর (রা.) এবং হযরত উমর (রা.)-কে ডাকেন এবং তাদেরকে পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করেন। তারা উভয়ে শত্রুদের পশ্চাদ্ধাবন করা উচিত মর্মে পরামর্শ প্রদান করেন। (কিতাবুল মাগাযি লিল ওয়াকিদি, ১ম খণ্ড, পৃ: ২৭৮)

অতএব, উহুদের মুজাহিদীন বা যোদ্ধারা- যাদের অধিকাংশই আহত ছিলেন, (তারা) নিজেদের ক্ষতস্থান বেঁধে তাদের মনিবের সাথে যাত্রা করেন।

আর লেখা আছে যে, এ সময় মুসলমানরা এরূপ আনন্দ ও উৎসাহ-উদ্দীপনা নিয়ে যাত্রা করে যেমনটি কোন বিজয়ী সৈন্যবাহিনী (বিজয়ের) পর শত্রুদের পশ্চাদ্ধাবনে বের হয়। আট মাইল দূরত্ব অতিক্রম করে তিনি (সা.) 'হামরাউল আসাদ'-এ পৌঁছেন। তখন যেহেতু সন্ধ্যা নেমে এসেছিল (তাই) তিনি (সা.) এখানেই শিবির স্থাপনের নির্দেশ প্রদান করেন এবং বলেন, মাঠের বিভিন্ন স্থানে আগুন প্রজ্জ্বলিত করা হোক। অতএব, নিমিষেই 'হামরাউল আসাদ' এর মাঠে পাঁচশ'টি অগ্নিশিখা প্রজ্জ্বলিত হয়, যা দূর থেকে দেখা প্রত্যেক ব্যক্তির হৃদয়কে ভীত-ত্রস্ত করতো। সম্ভবত এ সময়েই খুযাআ' গোত্রের মা'বাদ নামক একজন মুশরিক নেতা মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হন এবং তাঁর (সা.) কাছে উহুদের যুদ্ধে নিহতদের বিষয়ে সমবেদনা জ্ঞাপন করেন এবং এরপর আপন পথে যাত্রা করেন। পরদিন তিনি যখন রওহা নাম স্থানে পৌঁছেন তখন দেখেন কুরায়েশদের সেনাবাহিনী সেখানে শিবির স্থাপন করে রেখেছে এবং পুনরায় মদিনা অভিমুখে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে। মা'বাদ তৎক্ষণাৎ আবু সুফিয়ানের নিকট যায় এবং তাকে বলে, এ তোমরা কী করতে যাচ্ছ? খোদার কসম! আমি তো এখনি মুহাম্মদ (সা.)-এর সেনাবাহিনীকে হামরাউল আসাদে দেখে এলাম আর এমন প্রতাপশালী সেনাবাহীনি আমি কখনো দেখি নি।

উহুদের পরাজয়ের অনুতাপে তাদের মাঝে এমন উত্তেজনা কাজ করছে যে, তোমাদেরকে দেখামাত্র নিশ্চিহ্ন করে দেবে। আবু সুফিয়ান ও তার সঙ্গী-সাথীদের ওপর মা'বাদের কথায় এমন প্রভাব পড়ে যে, তারা পুনরায় মদিনা যাওয়ার সংকল্প ত্যাগ করে তৎক্ষণাৎ মক্কাভিমুখে যাত্রা করে। কুরায়েশদের সৈন্যবাহিনীর এভাবে পলায়ন করার সংবাদ পেয়ে মহানবী (সা.) আল্লাহর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন এবং বলেন, এটি খোদারই প্রতাপ যা কাফেরদের হৃদয়ের ওপর ভর করেছে। এরপর তিনি (সা.) হামরাউল আসাদে আরো দু'তিন দিন অবস্থান করেন।

(সীরাত খাতামান্নাবীঈন, পৃ: ৫০৪-৫০৫)

বনু মুস্তালিকের যুদ্ধ: বনু মুস্তালিকের যুদ্ধ সংঘটিত হয় পঞ্চম হিজরী সনের শা'বান মাসে। এই যুদ্ধকে মুরায়সীর যুদ্ধও বলা হয়। এর উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব লিখেন, কুরায়েশদের বিরোধিতা প্রতিনিয়ত আরো ভয়ঙ্কর রূপ পরিগ্রহ করছিল। তারা তাদের বিরোধিতায় আরবের বহু গোত্রকে ইসলাম ও ইসলামের প্রতিষ্ঠাতার বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু এখন তাদের শত্রুতা এক নতুন শঙ্কা সৃষ্টি করে দিয়েছে আর তা হলো, হেজাযের যেসব গোত্র মুসলমানদের সাথে সুসম্পর্ক রাখতো, তারাও এখন কুরায়েশের ষড়যন্ত্রের কারণে মুসলমানদের বিরুদ্ধে মাথাচাড়া দিতে শুরু করেছে। এক্ষেত্রে সর্বাগ্রে ছিল নামকরা গোত্র বনু খুযাআ। আর এদেরই একটি শাখা বনু মুস্তালিক মদিনার বিরুদ্ধে আক্রমণ করার প্রস্তুতি আরম্ভ করে দেয় এবং তাদের নেতা হারেস বিন আবি যিরার অত্র অঞ্চলের অন্যান্য গোত্রে সফর করে আরো কিছু গোত্রকেও নিজেদের সাথে যুক্ত করে নেয়। মহানবী (সা.) যখন উক্ত ঘটনা জানতে পারেন তখন তিনি বাড়তি সতর্কতা হিসাবে বুরায়দা বিন হুসায়েব নামক নিজের এক সাহাবীকে পরিস্থিতি সম্পর্কে খোঁজ নিতে বনু মুস্তালিক অভিমুখে পাঠান এবং তাকে উপদেশ দিয়ে বলেন, তিনি যেন যত দ্রুত সম্ভব ফিরে এসে মহানবী (সা.)-কে প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে অবগত করেন। বুরায়দা গিয়ে দেখেন, সত্যিই এক বড় জমায়েত এবং খুবই উদ্দীপনার সাথে মদিনায় আক্রমণ করার প্রস্তুতি চলছে। তিনি ত্বরিৎ ফিরে এসে মহানবী (সা.)-কে অবগত করেন এবং তিনি (সা.) যথারীতি মুসলমানদেরকে প্রতিরক্ষার জন্য বনু মুস্তালিকের দিকে যাত্রা করার নির্দেশ দেন এবং অনেক সাহাবী তাঁর (সা.) সাথে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে যান, এমনকি মুনাফিকদেরও একটি বড় সংখ্যা যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়, যারা এর আগে কখনো এত বড় সংখ্যায় যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে নি। মহানবী (সা.) নিজের অনুপস্থিতিতে হযরত আবু যার গিফারী বা কতিপয় বর্ণনা অনুসারে হযরত যায়েদ বিন হারেসাকে মদিনার আমীর নিযুক্ত করে আল্লাহর নাম নিয়ে পঞ্চম হিজরীর শাবান মাসে মদিনা থেকে যাত্রা করেন। বাহিনীতে কেবল ত্রিশটি ঘোড়া ছিল, যদিও উটের সংখ্যা কিছুটা বেশি ছিল। এই উট ও ঘোড়াতেই পালাক্রমে চড়ে মুসলমানরা সফর করেন। পথিমধ্যে মুসলমানরা কাফেরদের এক গুপ্তচরকে পেয়ে যায়। তারা তাকে ধরে মহানবী (সা.)-এর সকাশে উপস্থিত করে। সে যে আসলেই কাফেরদের গুপ্তচর এ বিষয়টি নিশ্চিত হওয়ার পর তিনি (সা.) তার কাছ থেকে কাফেরদের অবস্থা ও গতিবিধি সম্পর্কে জানতে চাইলেন, কিন্তু সে কিছু বলতে অস্বীকৃতি জানায়। আর যেহেতু তার আচরণ সন্দেহজনক ছিল তাই প্রচলিত রীতি অনুসারে যুদ্ধাবস্থার প্রেক্ষিতে হযরত উমর (রা.) তাকে হত্যা করেন আর এরপর ইসলামী সৈন্যবহিনী সম্মুখে অগ্রসর হয়। বনু মুস্তালিক গোত্র যখন জানতে পারে যে মুসলমানদের আগমন আসন্নপ্রায়, আর এই সংবাদও পায় যে তাদের গুপ্তচরকে হত্যা করা হয়েছে, তখন তারা ভয় পেয়ে যায়। কেননা তাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল কোনভাবে মদিনায় অতর্কিত আক্রমণ করা। কিন্তু মহানবী (সা.)-এর প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের কারণে এখন তাদের নাজেহাল অবস্থা হয়। তারা খুব ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে, আর অন্যান্য যেসব গোত্র তাদেরকে সাহায্য করতে এসেছিল, ঐশী পরিকল্পনার ফলে তারা এমন ভয় পেয়ে যায় যে, তারা তাদের সঙ্গ পরিত্যাগ করে স্ব-স্ব গৃহে ফিরে যায়। কিন্তু বনু মুস্তালিককে কুরায়েশরা মুসলিম-বিদ্বেষের নেশায় এতটা মাতাল করে দিয়েছিল যে তারা তবুও যুদ্ধ করার ইচ্ছা থেকে বিরত হয় নি এবং পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে ইসলামী বাহিনীর মোকাবেলার জন্য বসে থাকে। মহানবী (সা.) যখন মুরায়সী নামক স্থানে পৌঁছেন, যার পাশেই বনু মুস্তালিকের শিবির ছিল, যা মক্কা ও মদিনার মধ্যবর্তী স্থানে সমুদ্র উপকুলবর্তী একটি জায়গার নাম, তখন তিনি (সা.) সেখানে শিবির স্থাপনের নির্দেশ দেন। সৈন্যদের সারিবদ্ধ করা এবং পতাকা বিতরণের পর তিনি (সা.) হযরত উমরকে নির্দেশ দেন, তিনি যেন এগিয়ে গিয়ে বনু মুস্তালিকের মাঝে ঘোষণা প্রদান করেন যে, যদি এখনো তারা ইসলামের শত্রুতা পরিহার করে এবং মহানবী (সা.) এর শাসন মেনে নেয়, তাহলে তাদেরকে নিরাপত্তা দেওয়া হবে আর মুসলমানরা ফিরে যাবে। কিন্তু তারা দৃঢ়ভাবে এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে আর যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়। এমনকি বর্ণিত আছে, এ যুদ্ধে সর্বপ্রথম যে তীর নিক্ষেপ করা হয় তা তাদেরই একজন করেছিল। মহানবী (সা.) যখন তাদের এই অবস্থা প্রত্যক্ষ করেন, তখন তিনিও সাহাবীদের যুদ্ধের নির্দেশ দেন"। শত্রুপক্ষ বা বিরোধীরা যুদ্ধ আরম্ভ করে দিয়েছিল। "দু'পক্ষের মধ্যে স্বল্পক্ষণ তীর বিনিময় হয়। এরপর মহানবী (সা.) সাহাবীদের সংঘবদ্ধভাবে হামলা করার নির্দেশ দেন যে 'একযোগে আক্রমণ কর'; আর এই আকস্মিক হামলার ফলে কাফের বাহিনীর পা হড়কে যায়। কিন্তু মুসলমানরা এমন বুদ্ধিমত্তার সাথে তাদের পরিবেষ্টন করে যে পুরো জাতি অবরুদ্ধ হয়ে অস্ত্র সমর্পন করতে বাধ্য হয়। শুধুমাত্র দশজন কাফের এবং এক মুসলমানের মৃত্যুর মাধ্যমে এই যুদ্ধ, যা ভয়াবহ রূপ ধারণ করতে পারত, তা সমাপ্ত হয়ে যায় "

হযরত মির্যা বশির আহমদ সাহেব সীরাত খাতামান্নাবীঈন পুস্তকে লেখেন, এ ক্ষেত্রে এটিও উল্লেখ করা আবশ্যক, এ যুদ্ধ সম্পর্কে সহীহ্ বুখারীতে এরূপ একটি বর্ণনা রয়েছে যে, মহানবী (সা.) বনু মুস্তালিক গোত্রের উপর এমন সময় হামলা করেছিলেন যখন তারা অপ্রস্তুত অবস্থায় নিজেদের গবাদি পশুগুলোকে পানি পান করাচ্ছিল। কিন্তু গভীর দৃষ্টিতে দেখলে বোঝা যাবে, এই বর্ণনা ঐতিহাসিকদের বর্ণনার সাথে সাংঘর্ষিক নয়; বরং দু'টি বর্ণনা দুটো ভিন্ন সময়ের সাথে সম্পর্ক রাখে। ঘটনা হল, ইসলামী সৈন্যবাহিনী যখন বনু মুস্তালিকের কাছাকাছি পৌঁছয় তখন তারা মুসলমান বাহিনীর আগমনের কথা জানলেও মুসলমানরা যে একেবারে কাছে এসে গেছে-একথা জানতো না; তাই তারা যুদ্ধের জন্য অপ্রস্তুত ছিল। সেই অবস্থার দিকেই বুখারীর বর্ণনায় ইঙ্গিত রয়েছে। কিন্তু মুসলমানদের আসার সংবাদ পাওয়ার পর তারা তাদের পূর্ব প্রস্তুতি অনুসারে তাৎক্ষণিকভাবে যুদ্ধের জন্য সারিবদ্ধ হয়; এই অবস্থার কথাই ঐতিহাসিকরা উল্লেখ করেছেন। এই মতভিন্নতার এরূপ ব্যাখ্যাই আল্লামা ইবনে হাজার এবং অন্যান্য কতিপয় গবেষক করেছেন, আর এটিই সঠিক বলে প্রতীয়মান হয়। "

(সীরাত খাতামান্নাবীঈন, পৃ: ৫৫৭-৫৫৯)

বনু মুস্তালিকের যুদ্ধ থেকে ফিরে আসার পথেও একটি ঘটনা ঘটে; সহীহ মুসলিমে এর বর্ণনা রয়েছে। হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ বর্ণনা করেন, আমরা এক যুদ্ধে মহানবী (সা.) এর সাথে ছিলাম, অর্থাৎ বনু মুস্তালিকের যুদ্ধে। তখন মুহাজিরদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি আনাসারদের কোন এক ব্যক্তির পিঠে আঘাত করে। এর ফলে সেই আনসার 'হে আনসারগণ' বলে ডাক দেয়, আর মুহাজির ব্যক্তিও 'হে মুহাজিরগণ' বলে ডাক দেয়। অর্থাৎ আনসার এবং মুহাজির উভয়ই নিজ নিজ দলের লোকদের সাহায্যের জন্য আহ্বান জানায়। মহানবী (সা.)-এর নিকট এ বিষয়টি পৌঁছার পর তিনি (সা.) বলেন, এ কেমন অজ্ঞতার যুগের কথাবর্তা হচ্ছে? [অর্থাৎ তিনি (সা.) যখন এই হইচই শুনতে পান, তখন।] তারা বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! মুহাজিরদের এক ব্যক্তি আনসাদের এক ব্যক্তির পিঠে আঘাত করেছে। একথা শুনে তিনি (সা.) বলেন, এসব কথা বাদ দাও, এগুলো মন্দ কথা। এধরনের বৃথা কথা বলো না, সামান্য সামান্য কথায় ঝগড়াবিবাদ শুরু করে দিও না! আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই-ও সেখানে ছিল; সে একথা শুনার পর বলে, সে তো এমন করেছে, [অর্থাৎ একজন মুহাজির এক আনসারের কোমরে আঘাত করেছে, সে হয়তো একটা থাপ্পড়ই মেরেছিল বা হয়তো দু'টো থাপ্পড়ই মেরেছিল;] কিন্তু আল্লাহ্‌র কসম! আমরা মদিনায় ফিরে গেলে অবশ্যই সর্বাধিক সম্মানিত ব্যক্তি (নাউযুবিল্লাহ্) সর্বাধিক লাঞ্ছিত ব্যক্তিকে সেখান থেকে বের করে দেবে। একথা শুনে হযরত উমর (রা.) নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আপনি আমাকে এই মুনাফিকের (তথা কপট ব্যক্তির) শিরচ্ছেদ করার অনুমতি দিন। এর প্রেক্ষিতে হুযূর (সা.) বলেন, বাদ দাও। পাছে লোকজন এমন কথা না বলে বেড়ায় যে, মুহাম্মদ (সা.) নিজ সঙ্গীদের হত্যা করে!

(সহী মুসলিম, কিতাবুল বির ওয়াস সিলাহ, হাদীস-৬৫৮৩)

সীরাত খাতামান্নাবীঈন পুস্তকে এ ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ এভাবে বর্ণিত হয়েছে; এটি আমি বাদ দিচ্ছি, কেননা ইতিপূর্বেই এটি আমি

বর্ণনা করে দিয়েছি। যাহোক আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই-এর শেষের দিকের কথা উল্লেখ করে সীরাত ইবনে হিশামে লিখা আছে, এরপর আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই যখনই এমন অসঙ্গত কথা বলত তখন তার জাতির লোকেরাই তাকে চরম অলস বলত। রসূলুল্লাহ্ (সা.) যখন এ পরিস্থিতি সম্পর্কে জানতে পারেন তখন তিনি (সা.) হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.)-কে বলেন, হে উমর! যেদিন তুমি আমাকে তাকে হত্যা করার নির্দেশ দিতে বলেছিলে, [অর্থাৎ হত্যা করার অনুমতি চেয়েছিলে;] সেদিন যদি আমি তাকে হত্যা করার নির্দেশ দিতাম তাহলে মানুষ নাক সিটকাতো। কিন্তু এখন যদি সেসব লোককেই আমি তাকে হত্যা করার নির্দেশ দিই, তাহলে তারা নিজেরাই তাকে হত্যা করে ফেলবে। আজ দেখ! ধৈর্য ধারণ করার ফলে এবং (বাস্তব) পরিস্থিতি প্রত্যক্ষ করার দরুন একদিন যারা তার সহমর্মী ছিল, তারাই আজ তার বিরোধী হয়ে গেছে। এখন তারা তাকে হত্যা করতেও প্রস্তুত। হযরত উমর (রা.) বলেন, আল্লাহ্‌র কসম! আমি বুঝে গিয়েছি যে, বরকতের দৃষ্টিকোণ থেকে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কথা নিঃসন্দেহে আমার কথা অপেক্ষা অনেক মহান ছিল। (সীরাত ইবনে হিশাম, পৃ: ৬৭২)

মহানবী (সা.) যখন মুনাফিকদের নেতা আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই-এর জানাযার নামায পড়তে উদ্যত হন তখন হযরত উমর (রা.) নিবেদন করেন, আল্লাহ্ তা'লা আপনাকে মুনাফিকদের জানাযা নামায পড়তে নিষেধ করেছেন। তখন রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, আমাকে তার জন্য ইস্তেগফার করা বা না করা- দু'টোরই অধিকার দেওয়া হয়েছে। কাজেই মহানবী (সা.) তার জানাযার নামায পড়ান। এরপর যখন আল্লাহ্ তা'লা এধরনের লোকদের জানাযা পড়াতে পুরোপুরি নিষেধ করে দেন, তখন মহানবী (সা.) মুনাফিকদের জানাযার নামায পড়ানো বন্ধ করে দিয়েছিলেন।

(আল ইসতিয়াব ফি মারিফাতিল আসহাব, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৯৪১)

হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ্ (রা.)-এর পক্ষ থেকে আবু সালামা বর্ণনা করেছেন, খন্দকের যুদ্ধের দিন হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.) সূর্যাস্তের পর আসেন এবং কাফের কুরায়েশদের তিরস্কার করতে থাকেন। তিনি (রা.) বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমি তো আসরের নামায পড়তে পারি নি, কিন্তু সূর্য অস্ত গিয়েছে। মহানবী (সা.) বলেন, খোদার কসম! আমিও পড়ি নি। এর ফলে আমরা উঠে বুতহানের দিকে যাই। বুতহানও মদিনার উপত্যকাগুলোর একটি উপত্যকা। মহানবী (সা.) নামাযের জন্য ওজু করেন, সাথে আমরাও ওজু করি এবং সূর্যাস্তের পর আসরের নামায পড়ি; আর এরপর তিনি (সা.) মাগরিবের নামায পড়েন। এটি বুখারী শরীফের হাদীস।

(সহীহুল বুখারী, কিতাবু মুয়াকিতিস সালাত, হাদীস-৫৯৬) (মুজামুল বালদান, ১ম খণ্ড, পৃ: ৫২৯)

এ প্রসঙ্গে এই বিতর্ক হয়ে থাকে যে, খন্দকের যুদ্ধ চলাকালীন মহানবী (সা.) এবং তাঁর সাহাবীরা কত ওয়াক্তের নামায পড়তে পারেন নি। এ সম্পর্কে বিভিন্ন বর্ণনা পাওয়া যায়। যেমন, একটি বর্ণনা এরূপ যে, হযরত জাবের (রা.) বর্ণনা করেন, খন্দকের যুদ্ধের দিন হযরত উমর (রা.) সেই কাফেরদের তিরস্কার করে বলেন, সূর্যাস্ত হয়ে গিয়েছে অথচ আমি আসরের নামায পড়তে পারি নি। তিনি (রা.) বলেন, এজন্য আমরা বুতহান উপত্যকায় থামি। তিনি সেখানে সূর্যাস্তের পর (আসরের) নামায পড়েন এবং এরপর মাগরিবের নামায পড়েন। এটিও বুখারী শরীফেরই হাদীস। প্রথম বর্ণনায় ছিল যে তিনি মহানবী (সা.)-এর সাথে ছিলেন।

(সহীহুল বুখারী, কিতাবু মুয়াকিতিস সালাত, হাদীস-৫৯৮)

এরপর হযরত আলী (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) খন্দকের যুদ্ধের সময় বলেন, আল্লাহ্ তা'লা এই কাফেরদের বাড়িঘর এবং তাদের কবরগুলো আগুনে পরিপূর্ণ করে দিন, কেননা তারা আমাদেরকে (যুদ্ধক্ষেত্রে) ব্যস্ত রেখেছে এবং সালাতে উসতা, অর্থাৎ মধ্যবর্তী নামায আদায়ের সুযোগও দেয় নি, অথচ এদিকে সূর্যাস্ত হয়ে গিয়েছে। হযরত আলী (রা.)-এর বর্ণনাটিও বুখারী শরীফের।

(সহীহুল বুখারী, কিতাবু মুয়াকিতিস সালাত, হাদীস-৪১১১)

হযরত আবু উবায়দা বিন আব্দুল্লাহ্ (রা.) তার পিতার বরাতে বর্ণনা করেন, খন্দকের যুদ্ধের দিন মুশরিকরা মহানবী (সা.)-কে চার ওয়াক্ত নামায পড়া থেকে বিরত রাখে আর এ অবস্থায় রাতের ততটা অংশ অতিবাহিত হয়ে যায় যতটা আল্লাহ্ চেয়েছেন। বর্ণনাকারী বলেন, মহানবী (সা.) হযরত বিলাল (রা.)-কে আদেশ দিলে তিনি (রা.) আযান দেন। এরপর তিনি (সা.) ইকামত দিতে বলেন এবং যোহরের নামায পড়ান। পুনরায় ইকামত দিতে বলেন এবং আসরের নামায পড়ান। মহানবী (সা.) আবার ইকামত দিতে বলেন এবং মাগরিবের নামায পড়ান। এরপর পুনরায় তিনি (সা.) ইকামত দিতে বলেন এবং এশার নামায পড়ান। এটি মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বলের হাদীস। (মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল, ২য় খণ্ড, পৃ: ৬)

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এরূপ যাবতীয় বর্ণনাকে দুর্বল আখ্যা দিয়ে কেবল একটি বর্ণনাকে সঠিক ও নির্ভুল আখ্যায়িত করেন যাতে আসরের নামাযের কথা স্বাভাবিকের তুলনায় সংকীর্ণ সময়ে আদায় করার কথা বর্ণিত হয়েছে। খন্দকের যুদ্ধে মহানবী (সা.)-এর চার বেলার নামায ক্বাযা করা সম্পর্কে পাদ্রী ফতেহ্ মসীহ্‌র আপত্তির উত্তরে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন,

"খন্দক তথা পরিখা খনন করার সময় চার ওয়াক্তের নামায ক্বাযা করা হয়েছিল- এটি আপনার উপর শয়তানী প্ররোচনা। কেননা প্রথমত আপনাদের জ্ঞানের দৌড় এতটুকুই যে, 'ক্বাযা' শব্দ ব্যবহার করেছেন। ওহে মূর্খ! 'ক্বাযা' নামায আদায় করাকে বলা হয়, নামায পরিত্যাগ করাকে নয়! নামায পরিত্যাগ করাকে কখনোই ক্বাযা বলা হয় না। যদি কারো নামায বাকি রয়ে যায় তাহলে তাকে বলা হয় 'ফওত', অর্থাৎ নামায 'ফওত' হয়ে গিয়েছে। আমি কি এজন্যই পাঁচ হাজার রুপিয়ার (পুরস্কার ঘোষণা করে) বিজ্ঞাপন দিয়েছিলাম যেন এমন নির্বোধও ইসলামের উপর আপত্তি করে, যে এখনো 'ক্বাযা' শব্দের অর্থই জানে না! যে ব্যক্তি যথাস্থানে শব্দের প্রয়োগই করতে পারে না সেই নির্বোধ কীভাবে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়ে সমালোচনা করার যোগ্যতা রাখতে পারে? বাকি রইল- খন্দক তথা পরিখা খননের সময় চার ওয়াক্তের নামায একত্রে পড়া হয়েছিল; তো এই অজ্ঞতামূলক প্ররোচনার জবাব হল- আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, ধর্মে কোন কাঠিন্য নেই, অর্থাৎ এমন কোন কঠোরতা নেই যা মানুষের ধ্বংসের কারণ হবে। এজন্য তিনি প্রয়োজনের সময় এবং সংকটময় পরিস্থিতিতে নামাযগুলো একত্রে পড়ার এবং সংক্ষিপ্ত করার আদেশ দিয়েছেন। কিন্তু এক্ষেত্রে আমাদের কোন নির্ভরযোগ্য হাদীসে চার ওয়াক্ত নামায একত্রে পড়ার উল্লেখ নেই। বরং সহীহ্ বুখারীর ব্যাখ্যা ফাতহুল বারীতে বর্ণিত হয়েছে, ঘটনা কেবল এতটুকুই ঘটেছিল যে, এক বেলার নামায, অর্থাৎ আসরের নামায যথাসময়ের তুলনায় সংকীর্ণ সময়ে আদায় করা হয়েছিল।" এই বিরুদ্ধবাদীকে সম্বোধন করে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলছেন, "এখন যদি আপনি আমার সামনে থাকতেন তাহলে আপনাকে আমি সামনে বসিয়ে জিজ্ঞেস করতাম, চার বেলার নামায 'ফওত' হয়েছিল- এরূপ হাদীস কি আদৌ মুত্তাফাক আলাইহে (অর্থাৎ বুখারী ও মুসলিম উভয় গ্রন্থে বর্ণিত হাদীস)? তাছাড়া চার বেলার নামায অর্থাৎ যোহর ও আসর এবং মাগরিব ও এশা একসাথে পড়া তো শরীয়তের বিধান অনুসারেই বৈধ। তবে হ্যাঁ! একটি দুর্বল হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে যোহর, আসর, মাগরিব ও এশার নামায একত্রে পড়া হয়েছিল। কিন্তু অন্যান্য সহীহ্ হাদীস একে প্রত্যাখ্যান করে আর শুধু এতটুকুই সাব্যস্ত হয় যে, আসরের নামায সংকীর্ণ সময়ে পড়া হয়েছিল। "

(নুরুল কুরআন, সংখ্যা-২, রূহানী খাযায়েন, ৯ম খণ্ড, পৃ: ৩৮৯-৩৯০)

হুদায়বিয়ার সন্ধির ক্ষেত্রে হযরত উমর (রা.)-এর ভূমিকা সম্পর্কে যা কিছু লিপিবদ্ধ হয়েছে তা হলো, মহানবী (সা.) হযরত উমর বিন খাত্তাবকে মক্কায় প্রেরণের উদ্দেশ্যে ডেকে পাঠান যেন তিনি কুরায়েশ নেতাদের গিয়ে বলেন, হুযূর (সা.) কী উদ্দেশ্যে আগমন করেছেন। তখন হযরত উমর (রা.) নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! কুরায়েশদের পক্ষ থেকে আমার প্রাণের শঙ্কা আছে। কেননা তারা আমার সাথে তাদের শত্রুতা সম্পর্কে (বিশেষভাবে) অবগত। তারা জানে, আমি সেই কুরায়েশদের কত বড় শত্রু এবং আমি তাদের সাথে কতটা কঠোরতা করি। এছাড়া আমার গোত্র বনু আদী বিন কা'ব-এর কেউই মক্কায় নেই যে আমাকে

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

তোমাদিগকে আমি সত্য সত্যই বলিতেছি যে, যে ধর্মগ্রন্থ তোমাদিগেক দান করা হইয়াছে তাহা যদি খৃষ্টানদিগকে দেওয়া হইত, তাহা হইলে তাহারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইত না। **(কিশতিয়ে নূহ, পৃ: ২১)**

দোয়াপ্রার্থী: **Pervez Hossain Sb, Bolpur, Birbhum**

রক্ষা করবে। এজন্য তিনি কিছুটা সংকোচ ব্যক্ত করেন। এক বর্ণনা অনুসারে হযরত উমর (রা.) এসময় মহানবী (সা.)-এর সমীপে আরো নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আপনি চাইলে আমি তাদের নিকট যাচ্ছি। কিন্তু মহানবী (সা.) কিছুই বলেন নি। হযরত উমর (রা.) আরও নিবেদন করেন, আমি আপনাকে এমন ব্যক্তি সম্পর্কে বলছি যিনি কুরায়েশদের নিকট আমার চেয়ে অধিক সম্মানিত, অর্থাৎ হযরত উসমান বিন আফ্‌ফান (রা.)। তখন হুযূর (সা.) হযরত উসমান (রা.)-কে ডেকে এনে আবু সুফিয়ান এবং অন্যান্য কুরায়েশ নেতাদের নিকট প্রেরণ করেন যেন হযরত উসমান (রা.) তাদেরকে অবগত করেন যে, হুযূর (সা.) যুদ্ধের উদ্দেশ্যে আসেন নি; তিনি (সা.) কেবল কা'বার যিয়ারত এবং এর সম্মানের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের উদ্দেশ্যে এসেছেন।

(সীরাত ইবনে হিশাম, পৃ: ৬৮৫) (সুবালুল হুদা ওয়ার রুশশাদ, ৫ম খণ্ড, পৃ: ৪৬, ফি গাযওয়াতিল হুদাইবিয়াহ)

হযরত উসমান (রা.)-এর স্মৃতিচারণের সময় এ বিষয়টি বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে। হযরত মির্যা বশির আহমদ সাহেব (রা.) লিখেন,

যখন হুদায়বিয়ার সন্ধির শর্তাবলী লেখা হচ্ছিল তখন মক্কার কুরায়েশদের প্রতিনিধি সুহায়েল বিন আমরের পুত্র আবু জান্দাল বেড়ি ও হাতকড়া পরিহিত অবস্থায় বহু কষ্টে সেই সভায় এসে উপস্থিত হয়। মুসলমান হওয়ার কারণে মক্কাবাসীরা এই যুবককে বন্দী করেছিল এবং ভয়াবহ নির্যাতনের মধ্যে রেখেছিল। সে যখন জানতে পারে মহানবী (সা.) মক্কার এতটা নিকটে এসেছেন, তখন সে কোনক্রমে মক্কাবাসীর কবল থেকে মুক্ত হয়ে নিজ বেড়িতে জড়ানো অবস্থায় পড়িমড়ি করে হুদায়বিয়ায় পৌঁছে যায়। ঘটনাক্রমে সে সেই সময়েই গিয়ে উপস্থিত হয় যখন তার পিতা চুক্তির এই শর্ত লিখাচ্ছিল যে, মক্কার অধিবাসীদের মধ্য থেকে মুসলমানদের কাছে আগত প্রত্যেক ব্যক্তিকে ফেরত পাঠাতে হবে, যদিও সে মুসলমান হয়। আবু জান্দাল পড়িমড়ি করে মুসলমানদের সামনে উপস্থিত হয় এবং করুণ স্বরে চিৎকার করে বলে, হে মুসলমানেরা! কেবল ইসলামের জন্যই আমাকে এমন নিদারুণ শাস্তি দেওয়া হচ্ছে, আল্লাহ্‌র দোহাই লাগে আমাকে রক্ষা কর! এ দৃশ্য দেখে মুসলমানরা কেঁপে ওঠে, কিন্তু সুহায়েলও জেদ ধরে বসে এবং মহানবী (সা.)-কে বলে, এই চুক্তি অনুযায়ী আপনার কাছে আমি আমার প্রথম যে দাবিটি উপস্থাপন করছি তা হলো, আবু জান্দালকে আমার হাতে তুলে দিন। তখন মহানবী (সা.) বলেন, এই চুক্তি তো এখনো সম্পূর্ণই হয় নি; আলোচনা চলছে মাত্র, এখনো চূড়ান্ত হয় নি। সুহায়েল বলে, আপনি যদি আবু জান্দালকে ফেরত না দেন তাহলে ধরে নিন- এই চুক্তির প্রক্রিয়া ভেস্তে গিয়েছে। মহানবী (সা.) বিষয়টিতে ইতি টানার জন্য বলেন, আরে বাদ দাও না! আবু জান্দালকে না হয় দয়া ও অনুগ্রহস্বরূপই আমাদেরকে দিয়ে দাও। সুহায়েল বলে, না না, এটি কখনোই মানব না! তিনি (সা.) বলেন, সুহায়েল! জেদ করো না, আমার কথাটি মেনে নাও। সুহায়েল বলে, এ বিষয়টি আমি কখনোই মেনে নিতে পারব না। এ সময়ে আবু জান্দাল আবার চিৎকার করে বলে, হে মুসলমানেরা! তোমাদের এক মুসলমান ভাইকে কি এভাবে এই কঠোর নির্যাতিত অবস্থায় মুশরিকদের কাছে ফেরত পাঠানো হবে? এটি একটি আশ্চর্যের বিষয় যে, তখন আবু জান্দাল মহানবী (সা.) -এর কাছে নিবেদন করে নি বরং সাধারণ মুসলমানের কাছে নিবেদন করেছে। সম্ভবত এর কারণ এটি ছিল যে, সে জানতো, মহানবী (সা.)-এর হৃদয়ে যতই বেদনা থাকুক না কেন- চুক্তির প্রক্রিয়ায় তিনি (সা.) কোনক্রমেই কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হতে দিবেন না। কিন্তু সম্ভবত সাধারণ মুসলমানদের কাছে সে এই আশা করেছিল যে, তারা হয়ত আত্মাভিমানের ফলে, যখন সন্ধির শর্ত লিপিবদ্ধ করা হচ্ছিল মাত্র, তখন তারা এমন কোন পথ বের করবে যার ফলে তার মুক্তির ব্যবস্থা হবে। কিন্তু মুসলমনরা যত উত্তেজনায়-ই থাকুক না কেন,মহানবী (সা.)-এর ইচ্ছার বিরুদ্ধে তারা কোন পদক্ষেপ নিতে পারত না। তিনি (সা.) কিছুক্ষণ নীরব থেকে ব্যথাতুর কণ্ঠে আবু জন্দলকে বলেন, হে আবু জন্দল! ধৈর্য ধারণ কর আর খোদা তা'লার প্রতি দৃষ্টি রাখ। খোদা তা'লা তোমার জন্য এবং তোমার মতো অন্যান্য দুর্বল মুসলমানের জন্য অবশ্যই স্বয়ং কোন পথ বের করবেন, কিন্তু এই মুহূর্তে আমরা নিরুপায়, কেননা মক্কাবাসীদের সাথে চুক্তি নির্ধারিত হয়েছে আর আমরা এই চুক্তি পরিপন্থী কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারব না।

মুসলমানরা এই দৃশ্য দেখছিল আর ধর্মীয় আত্মাভিমানে তাদের চোখ রক্তবর্ণ ধারণ করছিল। কিন্তু আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)-এর সামনে ভয়ে তারা নিশ্চুপ ছিল। অবশেষে হযরত উমর (রা.) সইতে পারেন নি। তিনি মহানবী (সা.)-এর নিকটে আসেন। আর কম্পমান কণ্ঠে বলেন, আপনি কি খোদা তা'লার সত্য রসূল নন? তিনি (সা.) বলেন, হ্যাঁ, অবশ্যই (আমি আল্লাহ্‌র সত্য রসূল)। উমর বলেন, আমরা কি সত্যের ওপর (প্রতিষ্ঠিত) নই আর আমাদের শত্রুরা মিথ্যার উপর নয়? তিনি (সা.) বলেন, হ্যাঁ, বিষয় এমনই। উমর বলেন, তাহলে আমরা আমাদের সত্য ধর্মের বিষয়ে এই অপমান কেন সহ্য করব? তিনি (সা.) হযরত উমর (রা.)-এর অবস্থা দেখে সংক্ষিপ্ত বাক্যে বলেন, দেখ উমর, আমি খোদার রসূল। আমি আল্লাহ্ তা'লার অভিপ্রায় জানি এবং তাঁর বিরুদ্ধাচারণ করতে পারি না। আর তিনিই আমার সাহায্যকারী, অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লাই আমার সাহায্যকারী। কিন্তু হযরত উমর এর ক্ষোভ ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছিল। তিনি বলেন, আপনি কি আমাদের এ কথা বলেন নি যে, আমরা বায়তুল্লাহ্ তথা আল্লাহ্‌র ঘরের তাওয়াফ করব। তিনি (সা.) বলেন, হ্যাঁ, আমি অবশ্যই বলেছিলাম, কিন্তু আমি কি এটিও বলেছিলাম যে, এই তাওয়াফ নিশ্চিতভাবে এ বছরই হবে। তিনি বলেন, না, এমনটি বলেন নি। তিনি (সা.) বলেন, তাহলে অপেক্ষা কর। তুমি ইনশাআল্লাহ্ অবশ্যই মক্কায় প্রবেশ করবে এবং কাবাগৃহ তাওয়াফ তথা প্রদক্ষিণ করবে। কিন্তু এই উত্তেজিত অবস্থায় হযরত উমর আশ্বস্ত হন নি। তথাপি মহানবী (সা.)-এর যেহেতু বিশেষ প্রতাপ ছিল, তাই হযরত উমর সেখান থেকে সরে গিয়ে হযরত আবু বকর এর কাছে আসেন আর তাঁর সাথেও একই রকম উত্তেজনাপূর্ণ কথা বলেন। হযরত আবু বকরও সেরূপই উত্তর দেন, কিন্তু একই সাথে হযরত আবু বকর নসীহতস্বরূপ বলেন যে, দেখ উমর! সতর্ক থাক। আর আল্লাহ্‌র রসূলের 'রেকাবে' তুমি যে হাত রেখেছ, তা ঢিলা হতে দিও না। কেননা খোদার কসম, এই ব্যক্তি, যার হাতে আমরা নিজের হাত দিয়েছি, অবশ্যই সত্য। হযরত উমর বলেন, তখন আমি নিজ উত্তেজনায় যদিও এসব কথা বলেছি, কিন্তু পরবর্তীতে আমি অত্যন্ত অনুতপ্ত হই, আর আমি তওবা হিসেবে এই দুর্বলতার প্রভাবকে দূর করার জন্য বহু নফল আমল সম্পাদন করি, অর্থাৎ সদকা করি, রোযা রাখি, নফল নামায আদায় করি, ক্রীতদাস মুক্ত করি, যেন আমার এই দুর্বলতার দাগ মুছে যায়। "

(সীরাত খাতামান্নাবীঈন, পৃ: ৭৬৬-৭৬৮)

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) নিজ খিলাফতের পূর্বে জলসায় একটি বক্তৃতা করেছিলেন। তিনি জলসায় বক্তৃতা করতেন। সেখান থেকে এর সাথে সম্পর্কযুক্ত একটি অংশ আমি এখানে বর্ণনা করছি, তিনি বলেন, এতে কোন সন্দেহ নেই যে, ব্যাথা ও অস্থিরতার সেই চিৎকার, যা প্রশ্নের আকারে হযরত উমরের হৃদয় থেকে বের হয়েছে (তা) আরও বহু হৃদয়েও প্রচ্ছন্ন ছিল। যদিও এতে কোন সন্দেহ নেই যে, যে আবেগসমূহকে হযরত উমর ভাষা দিয়েছেন সেগুলো শুধু উমরেরই নয় বরং অন্যদেরও আবেগ ছিল। আর শত শত হৃদয়ে এরূপ চিন্তাভাবনা উত্তেজনা সৃষ্টি করে রেখেছিল, কিন্তু হযরত উমর-এর সেগুলো প্রকাশের সাহস দেখানো এমন এক ভুল হয়েছে যে, এর পর হযরত উমর সারা জীবন এর জন্য অনুতপ্ত ছিলেন। তিনি অনেক রোযা রাখেন, অনেক ইবাদত করেন, অনেক সদকা দেন, আর ইস্তিগফার করতে করতে সিজদাগাহকে সিক্ত করেন; কিন্তু অনুতাপের পিপাসা নিবারণ হয় নি। হুদায়বিয়ার উৎকণ্ঠা তো সাময়িক ছিল, যা আকাশ থেকে অবতীর্ণ রহমত খুব শীঘ্র প্রশান্তিতে বদলে দেয়; কিন্তু সেই উৎকণ্ঠা, যা অধৈর্য হয়ে করা এই প্রশ্নের কারণে উমরের হৃদয়ে সৃষ্টি করেছিল, তা এক স্থায়ী উৎকণ্ঠার রূপ নেয়, যা কখনো তাঁর পিছু ছাড়ে নি। সর্বদা আক্ষেপের সাথে তিনি এটিই বলতেন,'আমি যদি মহানবী (সা.)-কে সেই প্রশ্নটি না করতাম! তিনি বলেন, বহুবার আমি ভাবি যে, মৃত্যুশয্যায় শেষ নিঃশ্বাসের সময় হযরত উমর (রা.) যখন 'লা আলী ওয়ালা আলাইয়্যা' জপ করছিলেন যে, হে খোদা! আমি তোমার কাছে নিজের পুণ্যের প্রতিদান চাই না, তুমি আমার পাপসমূহ ক্ষমা কর; তখন সকল ভুলের চেয়ে বেশি একটি ভুলের কল্পনা হয়তো তাকে বিচলিত করে রেখেছিল, যা হুদায়বিয়ার মাঠে তাঁর দ্বারা সংঘটিত হয়েছিল। সন্ধি চুক্তি লেখার সময় সাহাবীদের উদ্বেগ এবং মন ভেঙে যাওয়ার চিত্র দেখে মহানবী (সা.)-এর হৃদয়ের অবস্থার রহস্য তাঁর (সা.) ঐশী প্রভু এবং সীমাহীন ভালোবাসা পোষণকারী সর্বোত্তম বন্ধু ছাড়া আর কেউ জানতো না। কিন্তু হযরত উমর (রা.)-এর কথার উত্তরে যে তিনটি মাত্র

বাক্য তার মুখ থেকে বের হয়েছিল, তাতে চিন্তাশীলদের জন্য তিনি অনেক কিছু বলে দিয়েছেন।"

[খুতবাতে তাহের, (খিলাফত-পূর্ব জলসা সালানার বক্তব্য, পৃ: ৪২৮]

হুদায়বিয়ার সন্ধির সময়ে মুসলমান এবং কুরায়েশদের মাঝে যে চুক্তি হয়েছিল তাতে হযরত উমরেরও স্বাক্ষর ছিল। এ ব্যাপারে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) লিখেন,এ চুক্তির দুটি প্রতিলিপি প্রস্তুত করা হয় এবং সাক্ষীস্বরূপ উভয়পক্ষের কয়েকজন সম্মানিত ব্যক্তি এতে স্বাক্ষর করেন। মুসলমানদের পক্ষ থেকে স্বাক্ষরকারীদের মাঝে হযরত আবু বকর, হযরত উমর, হযরত উসমান, হযরত আব্দুর রহমান বিন অউফ, সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস এবং আবু উবায়দা ছিলেন। চুক্তি সম্পাদনের পর সুহায়েল বিন আমর চুক্তির একটি প্রতিলিপি নিয়ে মক্কায় ফিরে যায় আর দ্বিতীয় প্রতিলিপিটি ছিল মহানবী (সা.) এর কাছে। "

(সীরাত খাতামান্নাবীঈন, পৃ: ৭৬৯)

হুদায়বিয়ার সন্ধি থেকে ফিরে আসার ব্যাপারে সীরাত খাতামান্নাবীঈন পুস্তকে লেখা আছে যে,কুরবানী ইত্যাদি শেষ করে মহানবী (সা.) মদিনায় ফিরে যাওয়ার নির্দেশ প্রদান করেন। তখন তাঁর হুদায়বিয়ায় আসার প্রায় কুড়ি দিন অতিবাহিত হয়ে গিয়েছিল। ফিরতি যাত্রায় যখন তিনি (সা.)উসফান এর নিকট 'কুরা আলগামিম'-এ পৌঁছেন, উসফান মক্কা থেকে ১০৩ কিলোমিটার দূরত্বে অবস্থিত, আর 'কুরা আলগামিম' উসফান থেকে আট মাইল দূরত্বে অবস্থিত একটি উপত্যকা। এটি ছিল রাতের বেলা, তিনি ঘোষণা করিয়ে সাহাবীদেরকে একত্রিত করেন এবং বলেন, আজ রাতে এমন একটি সূরা আমার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে যা আমার কাছে পৃথিবীর সকল জিনিসের চেয়ে প্রিয়। আর সেটি হলো এই-(সূরা ফাতাহ্ সম্পর্কে তিনি বলেন,)

"إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَيَنْصُرَكَ اللهُ نَصْرًا عَزِيزًا"

সূরা ফাতাহ্- এর ২-৪ নম্বর আয়াত এগুলো। এরপর এভাবেই চলমান থাকে। আর শেষে ২৮ নম্বর আয়াত হলো,

"لَقَدْ صَدَقَ اللهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ"

অর্থাৎ, হে রসূল! আমরা তোমাকে এক মহান বিজয় দান করেছি; যেন আমরা তোমার জন্য এমন এক যুগের আরম্ভ করি যাতে তোমার পূর্বের এবং ভবিষ্যতের যাবতীয় ভুলত্রুটি ক্ষমা করে দেওয়া হয়, আর যেন খোদা তা'লা স্বীয় কল্যাণরাজি তোমার জন্য পূর্ণ করে দেন এবং তোমার জন্য সফলতার সোজা পথ খুলে দেন। আর খোদা তা'লা অবশ্যই তোমাকে জোরালোভাবে সাহায্য করবেন। সত্য কথা হলো এই যে, খোদা তা'লা স্বীয় রসূলের এই স্বপ্ন পূর্ণ করেন যা তিনি তাকে দেখিয়েছিলেন, কেননা এখন তুমি ইনশাআল্লাহ্ অবশ্য অবশ্যই শান্তিপূর্ণ অবস্থায় মসজিদুল হারামে প্রবেশ করবে আর কুরবানীর (পশুসমূহ) খোদার পথে উৎসর্গ করে নিজেদের মাথা মুণ্ডন করবে অথবা চুল ছোট করবে আর তোমাদের কোন ভয় থাকবে না। অর্থাৎ এ বছর তোমরা যদি মক্কায় প্রবেশ করতে তাহলে এই প্রবেশ করা শান্তিপূর্ণ হতো না, বরং যুদ্ধ ও রক্তক্ষয়ের প্রবেশ হতো, কিন্তু খোদা তা'লা স্বপ্নে শান্তিপূর্ণ প্রবেশ দেখিয়েছিলেন। এ কারণে খোদা তা'লা এ বছর সন্ধির মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছেন, আর এখন অচিরেই তোমরা খোদার দেখানো স্বপ্ন অনুযায়ী শান্তিপূর্ণ অবস্থায় মসজিদুল হারামে প্রবেশ করবে। অতএব এমনই হয়েছে।

মহানবী (সা.) যখন এই আয়াতসমূহ সাহাবীদেরকে শুনান, যেহেতু কতক সাহাবীর হৃদয়ে তখনও হুদায়বিয়ার সন্ধির তিক্ততা বিদ্যমান ছিল, তাই তারা এটি ভেবে আশ্চর্যান্বিত হন যে, আমরা তো বাহ্যত ব্যর্থ হয়ে ফিরে যাচ্ছি, অথচ আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে বিজয়ের অভিবাদন জানাচ্ছেন! এমনকি কতক ত্বরাপরায়ণ সাহাবী এরূপ কথাও বলে বসেন যে, আমরা বায়তুল্লাহ্ শরীফের তাওয়াফ না করেই ফিরে যাচ্ছি- এটাই কি বিজয়? এ কথা জানতে পেরে মহানবী (সা.) অত্যন্ত অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন এবং একটি সংক্ষিপ্ত বক্তৃতায় জোরালোভাবে বলেন, এটি একেবারেই বাজে আপত্তি, কেননা গভীর দৃষ্টিপাতে বুঝা যায় যে, প্রকৃত অর্থেই হুদায়বিয়ার সন্ধি আমাদের জন্য অনেক বড় একটি বিজয়। কুরায়েশরা আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ময়দানে অবতীর্ণ হয়েছিল, (এখন) তারা নিজেরাই যুদ্ধ পরিত্যাগ করে শান্তিচুক্তি করেছে এবং আগামী বছর আমাদের জন্য মক্কার দরজা উন্মুক্ত করে দেওয়ার অঙ্গীকার করেছে। আর আমরা শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে মক্কাবাসীর নৈরাজ্য থেকে সুরক্ষিত অবস্থায় ভবিষ্যত বিজয়ের সুগন্ধ নিয়ে ফিরে যাচ্ছি। অতএব নিশ্চিতভাবে এটি একটি মহান বিজয়। তোমরা কি সেসব দৃশ্য বিস্মৃত হয়েছ যে, এই কুরায়েশরাই উহুদ এবং আহযাবের যুদ্ধে তোমাদের বিরুদ্ধে কীভাবে চড়াও হয়েছিল? আর এই ভূপৃষ্ঠ প্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও তোমাদের জন্য সংকীর্ণ হয়ে গিয়েছিল, তোমাদের দৃষ্টি নিথর হয়ে গিয়েছিল এবং ভয়ে তোমাদের প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে উঠেছিল! অথচ আজ সেই কুরায়েশরাই তোমাদের সম্মুখে শান্তিচুক্তি করছে। সাহাবীগণ (রা.) বলেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! আমরা বুঝে গিয়েছি, আমরা বুঝতে পেরেছি। আপনার দৃষ্টিভঙ্গির ন্যায় আমরা চিন্তা করতে পারি নি, কিন্তু এখন আমরা বুঝে গিয়েছি যে, সত্যিই এ চুক্তি আমাদের জন্য এক মহান বিজয়।

মহানবী (সা.)-এর এই বক্তৃতার পূর্বে হযরত উমর (রা.)-ও অনেক দ্বিধান্বিত ছিলেন। অতএব তিনি (রা.) স্বয়ং বর্ণনা করেন যে, হুদায়বিয়া থেকে ফিরে আসার সময় মহানবী (সা.) যখন রাতের বেলায় সফরে ছিলেন, তখন আমি তাঁর (সা.) সমীপে উপস্থিত হই এবং তাঁকে (সা.) সম্বোধন করে কিছু নিবেদন করতে চাইলে তিনি (সা.) নিশ্চুপ থাকেন। আমি দ্বিতীয় এবং তৃতীয়বার কিছু নিবেদন করতে চাইলেও তিনি (সা.) বরাবরের মতোই নিশ্চুপ থাকেন। মহানবী (সা.)-এর নীরবতায় আমি ভীষণ দুঃখ পাই এবং আমি মুসলমানদের দল থেকে সবার সামনে চলে যাই আর আমি মনে মনে এই কথাই বলছিলাম যে, হে উমর! তুমি তো ধ্বংস হয়ে গিয়েছ, কেননা তিনবার মহানবী (সা.)-কে সম্বোধন করা সত্ত্বেও তিনি (সা.) নীরব ছিলেন, আর আমি এই দুঃখে অস্থির ছিলাম যে, ব্যাপার কী? আর আমার মনে এই ভীতি সৃষ্টি হয় যে, আমার বিষয়ে কোথাও আবার কুরআনের কোন আয়াত অবতীর্ণ না হয়ে যায়? এরই মাঝে কোন এক ব্যক্তি আমার নাম ধরে ডেকে বলে, উমর বিন খাত্তাবকে মহানবী (সা.) স্মরণ করেছেন। আমি (মনে মনে) বললাম, নিশ্চয় আমার বিষয়ে কোন কুরআনী আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। অতঃপর আমি ভীত-সন্ত্রস্ত হৃদয়ে দ্রুত মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হই এবং সালাম দিয়ে তাঁর পাশে গিয়ে দাঁড়াই। তিনি (সা.) বলেন, আমার প্রতি এই মুহূর্তে এমন একটি সূরা অবতীর্ণ হয়েছে যা আমার কাছে জগতের সবকিছুর চেয়ে অধিক প্রিয়। এরপর তিনি (সা.) সূরা ফাতাহ্'র আয়াত তিলাওয়াত করেন। হযরত উমর (রা.) নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! এই সন্ধি কি সত্যিই ইসলামের বিজয়? তিনি (সা.) বলেন, নিঃসন্দেহে এটি আমাদের বিজয়। এ কথা শুনে হযরত উমর (রা.) নিশ্চিন্ত হয়ে নীরব হয়ে যান। অতঃপর মহানবী (সা.) মদিনায় প্রত্যাবর্তন করেন।"

(সীরাত খাতামান্নাবীঈন, পৃ: ৭৭০-৭৭২)

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় মহানবী (সা.) মক্কার মুশরেকদের সাথে সন্ধিচুক্তিতে আবদ্ধ হন, যার ফলে সাহাবীদের হৃদয়ে এতই অস্থিরতা সৃষ্টি হয় যে, হযরত উমর (রা.)-এর ন্যায় ব্যক্তি মহানবী (সা.)-এর কাছে গিয়ে নিবেদন করেন যে, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! আল্লাহ্তা'লা কি আপনাকে প্রতিশ্রুতি দেন নি যে, আমরা কা'বা গৃহের তাওয়াফ করব? অথবা ইসলামের বিজয় কি সুনিশ্চিত নয়? মহানবী (সা.) উত্তরে বলেন, কেন নয়। হযরত উমর (রা.) নিবেদন করেন, তাহলে আমরা আনত হয়ে সন্ধি কেন করেছি? রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তা'লা এ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, আমরা তাওয়াফ করব কিন্তু একথা বলেন নি যে, এ বছরই করব।"

(খুতবাতে মাহমুদ, খণ্ড-৩০, পৃ: ২২০)

হযরত উমর (রা.)-এর স্মৃতিচারণ চলছে আর আগামীতেও চলবে ইনশাআল্লাহ্।

এখন আমি কয়েকজন প্রয়াত ব্যক্তির স্মৃতিচারণ করব যাদের জানাযাও পড়াব। প্রথম স্মৃতিচারণ হলো মুকাররম মালেক মুহাম্মদ ইউসুফ সেলিম সাহেবের, যিনি দ্রুতলিখন বিভাগের প্রধান ছিলেন। ৮৬ বছর বয়সে তিনি পরলোক গমন করেন, **ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন'** । তিনি তার পরিবারের একমাত্র আহমদী ছিলেন। তিনি ১৯৫২ সালে আহমদীয়াত

গ্রহণ করেন। তার বড় ভাই তাকে রেলওয়েতে চাকরির ব্যবস্থা করে দেন। তৎকালীন রেলের চীফ ইঞ্জিনিয়ার মীর হামিদুল্লাহ্ সাহেব একজন আহমদী ছিলেন। সেখানে আল ফযল আসত এবং মীর হামিদুল্লাহ্ সাহেব তবলীগও করতেন। তিনি (অর্থাৎ মালেক মুহাম্মদ ইউসুফ সাহেব) আল ফযল পড়ে আহমদী হয়েছিলেন। তার পরিবারের সদস্যরা যখন তার আহমদীয়াত গ্রহণের বিষয়ে অবগত হয় তখন তারা তাকে অনেক ভয়-ভীতি প্রদর্শন করে, এমন কি প্রাণ নাশের হুমকি দিয়ে আহমদীয়াত পরিত্যাগ করতে বলে, কিন্তু তিনি নিজ ঘরবাড়িই ছেড়ে দেন, তবুও আহমদীয়াত ছাড়েন নি। অবশেষে বিপদ যখন অনেক বেশি বৃদ্ধি পায় তখন তার ঘর ছাড়ার ঘটনা কিছুটা এরূপ যে, তার মা এক রাতে তার ভাইদের অগোচরে তাকে চুপিচুপি বলেন, এখান থেকে চলে যাও এবং আর কখনো এখানে ফিরে এসো না, অন্যথায় তোমার প্রাণ নাশের শঙ্কা আছে। তিনি লাহোরের পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামিয়্যাত বিভাগে স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেন। অতঃপর ১৯৫৮ সালে জামেয়া আহমদীয়ায় ভর্তি হন। ১৯৬৩ সালে জামেয়া পাশ করে বের হন। এরপর তৎকালীন মুফতি সিলসিলাহ মোহতরম মালেক সাইফুর রহমান সাহেবের সাথে ইফতা দফতরে তার পদায়ন হয়। ১৯৬৭ সালে তিনি 'যুদ নাবিসি' তথা দ্রুতলিখন বিভাগে বদলি হন যখন 'যুদ নাবিসি' তথা দ্রুতলিখন দফতরের প্রধান মওলানা মুহাম্মদ ইয়াকুব তাহের সাহেবের প্রয়াণে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) তাকে উক্ত বিভাগে তার স্থলে নিজ সান্নিধ্যে নিযুক্ত করেন। ১৯৮৫ সাল পর্যন্ত তিনি উক্ত 'যুদ নাবিসি' তথা দ্রুতলিখন দফতরের ইনচার্জ ছিলেন। দ্রুতলিখন বিভাগে তার দায়িত্ব ছিল হযরত খলীফাতুল মসীহ্র খুতবা, বক্তৃতা, বিভিন্ন অনুষ্ঠানের প্রতিবেদন, ভ্রমণের প্রতিবেদন ইত্যাদি প্রস্তুতকরণ। ১৯৭৮ সালে লন্ডনে অনুষ্ঠিত 'কাসরে সালিব' কনফারেন্সে, হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) যোগদান করেছিলেন। সেই যাত্রায় তিনিও হুযূর (রাহে.)-এর সহযাত্রী ছিলেন এবং প্রতিবেদন প্রস্তুত করেছিলেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্রাবে (রাহে.)-এর সাথে 'সওয়ানেহ্ ফযলে উমর'-এর প্রস্তুতিতেও তিনি যথেষ্ট সহায়তা করেন এবং খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) অতি উত্তমরূপে তাঁর কথা উল্লেখ করেছেন।হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) ১৯৮৩ সালে যখন অস্ট্রেলিয়া, ফিজি এবং সিঙ্গাপুর সফর করেছিলেন তখন মালেক ইউসুফ সেলিম সাহেবও হুযূরের সাথে ছিলেন। আর হিজরতের পর জুমুআর খুতবার অডিও ক্যাসেট এর কপি তৈরির কাজও তিনি অতি উত্তমরূপে সম্পাদন করেন। যেহেতু সতর্ক থাকতে হতো, তাই নিজে ফয়সালাবাদ গিয়ে কোন ঘরে বসে অডিও ক্যাসেট তৈরি করতেন এবং সাথে নিয়ে ফিরতেন। তিনি মুরব্বী হিসেবেও কয়েক বছর কর্মক্ষেত্রে ছিলেন। তাহের ফাউণ্ডেশনের অধীনে জুমুআর খুতবার কাজ করার সুযোগ হয়েছে। প্রাইভেট সেক্রেটারী দপ্তরে মজলিসে শূরার কার্যবহি লিখারও সুযোগ হয়েছে। যাহোক, অবসর গ্রহণের পরেও বার বার তাকে পুনঃনিয়োগ দেওয়া হয়েছে। অবশেষে ২০১৩ সালে অসুস্থতার কারণে তিনি স্থায়ীভাবে অবসর নিয়ে নেন। তার দুই স্ত্রী ছিলেন। প্রথম ঘরে তার এক কন্যা সন্তান জন্ম গ্রহণ করে। এরপর তার প্রথম স্ত্রী মারা যান। অতঃপর তিনি দ্বিতীয় বিয়ে করেন। যে ঘরে তার দুই ছেলে এবং তিন মেয়ে রয়েছে। তার মেয়ে কুদসিয়া মাহমুদ সরদার লিখেন, আমাদের পিতা স্বয়ং আল্লাহ্র সাথে সম্পর্ক স্থাপন করেন এবং আমাদেরকেও এই বিষয়ে জোর তাগিদ দিতেন। অত্যন্ত কঠোরভাবে নামাযের অভ্যাস করাতেন। বিলম্বে নামায পড়লে অসন্তুষ্ট হতেন। তাহাজ্জুদে অত্যন্ত বিগলিত চিত্তে দোয়া করতেন। দৈনিক পবিত্র কুরআনের এক পারা তিলাওয়াত করতেন। এমনকি অসুস্থ অবস্থায়ও সর্বদা নামাযের সময় জিজ্ঞেস করতেন। নামাযের ব্যাপারে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। তিনি আমাদের মাঝে খিলাফতের প্রতি ভালোবাসা এবং আনুগত্যের অনুপ্রেরণা পরিপূর্ণভাবে প্রোথিত করেছেন। খিলাফতের প্রতি সীমাহীন ভালোবাসা রাখতেন। তিনি বলতেন, খিলাফতের আনুগত্যের মাঝেই সকল কল্যাণ নিহিত। আহমদীয়াতের খাতিরে অনেক কষ্ট সহ্য করেছেন। সহকারী প্রাইভেট সেক্রেটারী রশিদ তৈয়্যব সাহেব বলেন, তৃতীয় খিলাফতের সময় ইউসুফ সেলিম সাহেব দ্রুতলিখন বিভাগে বদলি হন। এই বিভাগে তিনি দীর্ঘকাল সেবা করেছেন। বিভিন্ন বক্তৃতার লিখিত রূপ প্রণয়ন করতেন। জামা'তী পত্রিকা আল-ফযলের জন্য প্রতিবেদন প্রস্তুত করতেন। অত্যন্ত দায়িত্বশীলতার সাথে সুষ্ঠু ও উন্নত পদ্ধতিতে কাজ করতেন। তার সাহিত্যের মানও অনেক উন্নত ছিল। আর আমি যেমনটি বলেছি, খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) এবং খলীফাতুল মসীহ্ রাবের (রাহে.)-এর সাথে বহির্দেশে বিভিন্ন সফরে আফ্রিকা ও ইউরোপে যাওয়ার সুযোগ হয়েছে তার। অত্যন্ত সূক্ষ্মতার সাথে নিজের কাজ করতেন। প্রত্যেকটি শব্দ লিখার ক্ষেত্রে অনেক চিন্তা-ভাবনা ও সতর্কতা অবলম্বন করতেন আর দোয়া করে লিখতেন যে, মূল অর্থের সাথে কোন পার্থক্য যেন না হয়। ২০১৩ সালে তিনি যখন অবসর গ্রহণ করেন তখনও শূরার রিপোর্ট তৈরির ক্ষেত্রে কোন সমস্যা হলে প্রাইভেট সেক্রেটারীর অফিসে যখনই তাকে ডাকা হতো তৎক্ষনাৎ উপস্থিত হয়ে যেতেন। আর সর্বদা এ কথাই বলতেন যে, আমি এটিকে নিজের জন্য সৌভাগ্য মনে করি।

আমার মন-মস্তিষ্কেও সর্বদা তার সম্পর্কে এই চিত্রই রয়েছে যে, তিনি অত্যন্ত শান্ত প্রকৃতির একজন মানুষ যিনি নিজের কাজে মগ্ন থাকতেন আর ওয়াকফের সকল শর্তও তিনি পূরণ করেছেন। নীরবে সকল কাজ করতেন। কোন ধরনের চাহিদা ছিল না। অত্যন্ত সরলতার সাথে দিনাতিপাত করতেন। আল্লাহ্ তা'লা তার সাথে ক্ষমা ও অনুগ্রহের আচরণ করুন। তার সন্তানদেরও তার আদর্শ ধরে রাখার তৌফিক দিন।

দ্বিতীয় স্মৃতিচারণ ওয়াকফে জিন্দেগী মোকাররম শুয়াইব আহমদ সাহেবের, যিনি কাদিয়ানের দরবেশ মরহুম বশির আহমদ সাহেব কালা আফাগানী সাহেবের পুত্র ছিলেন। তিনি ৫৬ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করে, **ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন'** । ১৯৮৭ সালে তিনি জামা'তে চাকরি গ্রহণ করেন। সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়ার বিভিন্ন দপ্তরে কর্মী, উর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং নাযের হিসেবে সেবা করেছেন। দপ্তরে উলীয়া, অডিটর সদর আঞ্জুমান আহমদীয়া বিভাগের ইনচার্জ, নাযের বাইতুল মাল (ব্যয়), নাযেম ওয়াকফে জাদীদ মাল, অফিসার জলসা সালানা, খোদ্দামুল আহমদীয়া ভারতের সদর হিসেবে সেবা করার সুযোগ তিনি পেয়েছেন। তার সেবাকাল ৩৩ বছরেরও অধিক। ইবাদতের প্রতি তার গভীর মনোযোগ ছিল, তাহাজ্জুদ ও নফল নামাযে নিয়মিত ছিলেন। মরহুমের খিলাফতের আনুগত্যের মানও অনেক উন্নত ছিল। সবসময় বলতেন, যে নির্দেশই আসে, তা তৎক্ষণাৎ পালন করতে হবে। কুরআন শরীফের গভীর জ্ঞান রাখতেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) ও জামা'তের খলীফাদের রচনাবলীও অধ্যয়ন করতেন। ধর্মীয় জ্ঞানও ব্যাপক ছিল। সব বিষয়ে বক্তৃতা করার দক্ষতা রাখতেন। অত্যন্ত সদাচারী ও মিশুক প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। সকল শ্রেণীর মানুষের সাথে তাঁর আচরণে ভালোবাসা ফুটে উঠত। অভাবী ও অধীনস্তদের প্রতি পূর্ণ যত্নবান ছিলেন। কাদিয়ানের প্রত্যেক ব্যক্তি তার খুব প্রশংসা করছে। আত্মবিশ্বাসী ও কৃতজ্ঞও ছিলেন। মরহুম ওসীয়্যতাকারী ছিলেন। শোকসন্তপ্ত পরিবারে স্ত্রী ছাড়াও দুই পুত্র রয়েছে। তিনি কাদিয়ানের সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়ার সদর জালালুদ্দীন নাইয়ার সাহেবের জামাতা ছিলেন।

কাদিয়ানের নাযের বায়তুল মাল আমদ রফিক বেগ সাহেব লিখেন, তার সাথে আঠারো বছর যাবৎ ভারতের মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া এবং কাদিয়ানের জলসা সালানা দপ্তরে সেবা করার সুযোগ হয়েছে। তিনি নিজের ব্যবহারিক দৃষ্টান্তের মাধ্যমে অন্যান্য সেবকদের নিজের সাথে এগিয়ে নিয়ে চলতেন। জলসা সালানার সময়ও রাত তিনটা-চারটা পর্যন্ত দপ্তরেই থাকতেন এবং (অতিথিদের) থাকার স্থানগুলোর খোঁজ-খবর নিতেন; কোথাও কম-বেশি দেখতে পেলে সাথে সাথে গিয়ে তা শুধরে দিতেন। প্রত্যেক কর্মীকে সর্বদা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর অতিথিদের যথোপযুক্ত খেয়াল রাখার বিষয়ে জোরালো উপদেশ দিতেন। যদি কোন কর্মীর পক্ষ থেকে কোন অতিথির সাথে বাড়াবাড়ি হয়ে যেত

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

যতক্ষণ না প্রিয় থেকে প্রিয়তর বস্তুকে ব্যয় করবে, ততক্ষণ খোদার নৈকট্যভাজন হওয়ার মর্যদা লাভ হতে পারে না।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড , পৃ: ৬৪)

দোয়াপ্রার্থী: Begum Aseya Khatun, Harhari (Murshidabad)

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

তোমরা যদি চাও যে, আকাশে আল্লাহতালা তোমাদের উপর সন্তুষ্ট হন, তাহা হইলে তোমরা সহোদর দুই ভ্রাতার ন্যায় পরস্পর এক হইয়া যাও।

(কিশতিয়ে নূহ, পৃ: ২৫)

দোয়াপ্রার্থী: Sabina Yasmin, Bilaspur (Chhattisgarh)

তবে নিজে গিয়ে ক্ষমা চাইতেন। তার ভগ্নিপতিও লিখেছেন যে, তিনি বলতেন, আমি পৃথিবীতে কখনো কারো সাথে শত্রুতা পোষণ করি নি। ওকালতে মাল তাহরীকে জাদীদের একজন ইন্সপেক্টর লিখেন, ভারতের কেরালা, তামিলনাড়ু প্রভৃতি প্রদেশে তাদের পঁচাত্তর দিনব্যাপী দীর্ঘ প্রাদেশিক সফর ছিল; সফর চলাকালীন আমি অসুস্থ হয়ে পড়লে তিনি এমনভাবে আমার সেবা-শুশ্রূষা করেন যেভাবে কোন পিতামাতা করে থাকে। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের প্রতি ক্ষমা ও কৃপাসুলভ ব্যবহার করুন, তার স্ত্রী-সন্তানদের ধৈর্য ও প্রশান্তি দান করুন এবং মরহুমের পুণ্যসমূহ বহমান রাখার সামর্থ্য দান করুন।

পরবতী স্মৃতিচারণ হলো কাদিয়ানের মুবাল্লেগ সিলসিলা মোকাররম মাকসুদ আহমদ ভাট্টি সাহেবের, যিনি গত ১৮ মেতারিখে ৫২ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন; **ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন'** । তিনি জম্মু-কাশ্মীর প্রদেশের রাজৌরি জেলার চারকোর জামা'তের সদস্য ছিলেন। তার সেবাকাল প্রায় ত্রিশ বছর বিস্তৃত। তিনি লক্ষ্ণৌয়ের আঞ্চলিক আমীর এবং প্রায় এক বছর শ্রীনগরে মুবাল্লেগ ইনচার্জ হিসেবে সেবা করার সৌভাগ্য লাভ করেন। ২০১৭ থেকে মৃত্যু পর্যন্ত ফুল-টাইম কেন্দ্রীয় কাযী বা মীমাংসাকারী হিসেবে সেবার সুযোগ পান। কাযা বা বিচার বিভাগে অত্যন্ত দক্ষতা ও নিষ্ঠার সাথে নিজের দায়িত্ব পালন করছিলেন। কয়েক ডজন মামলার মীমাংসা করেন। নিজের উপর অর্পিত দায়িত্ব সম্পর্কে অনেক চিন্তা করতেন, এমনকি সম্প্রতি অসুস্থ হয়ে যখন হাসপাতালে ছিলেন তখনও কাজের ব্যাপারে চিন্তিত ছিলেন; তিনিও করোনায় আক্রান্ত হয়েছিলেন। অত্যন্ত মিশুক প্রকৃতির, প্রফুল্লচিত্ত, সাহসী, সূক্ষ্মদর্শী ও সুদক্ষ ওয়াকফে যিন্দেগী ছিলেন। মরহুম ওসীয়্যতকারী ছিলেন। শোকসন্তপ্ত পরিবারে মা ও তিন ভাই ছাড়াও স্ত্রী ও তিন কন্যা রেখে গিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের প্রতি ক্ষমা ও কৃপাসুলভ ব্যবহার করুন, তার কন্যাদেরও নিজ নিরাপত্তার ছায়াতলে রাখুন এবং তার পুণ্যসমূহ বহমান রাখার সামর্থ্য দান করুন।

পরবতী স্মৃতিচারণ হলো ফয়সালাবাদের জাভেদ ইকবাল সাহেবের, যিনি ৬৬ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন; **'ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন'**। তার পুত্র তালহা জাভেদ সাহেব লিখেন যে, তাদের পরিবারে আহমদীয়াতের সূচনা তার প্রপিতামহ বাবা চাকীরা-র মাধ্যমে হয়েছিল, যার এই নামটি চাকি বা জাঁতা বানানো ও মেরামত করার পেশার কারণে প্রসিদ্ধ হয়েছিল। তিনি অলিগলিতে উচ্চস্বরে হাঁক দিয়ে কাজ করতেন এবং সেসময় তিনি উচ্চস্বরে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পঙক্তি আবৃত্তি করতে থাকতেন যেন তবলীগের পথও উন্মুক্ত হয়। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তিনি নিয়মিত নামায আদায় ছাড়াও নিয়মিত তাহাজ্জুদ আদায়কারী ছিলেন; আবশ্যিকভাবে তাহাজ্জুদ পড়তেন। পরিবারের সদস্যদেরও বাজামা'ত নামায পড়ার ব্যাপারে জোরালো নির্দেশ দিতেন, বরং বাড়িতে নিয়মিত বাজামা'ত নামায আদায়ের ব্যবস্থা করা হতো। নিয়মিতভাবে কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করতেন, সেইসাথে অনুবাদও পড়তেন।বিশেষ যত্নসহকারে খুতবা শোনার আয়োজন করতেন এবং বাড়ির সদস্যদের সাথে নিয়ে বসে এম.টি.এ.-তে খুতবা শুনতেন। তার মাঝে ধর্ম সেবার জন্য এক উন্মাদনা ছিল। ১৯৮৪-এর পরিস্থিতির পর যখন জামা'তী অডিও ক্যাসেটের মাধ্যমে যুগ-খলীফার খুতবা বিভিন্ন জামা'তে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করা হতো, তখন একটি কাপড়ের ব্যাগে ক্যাসেট ভরে সাইকেলে চেপে তিনি গ্রামে গ্রামে ঘুরে খুতবা পৌঁছে দিতেন। আর যখন এম.টি.এ.-র সূচনা হয়, তখন নিজের বাড়িতে ডিশ বসিয়ে মানুষকে আমন্ত্রণ করে খুতবা শোনানোর ব্যাবস্থা করতেন। মরহুম শোকসন্তপ্ত পরিবারে তার মা, স্ত্রী আমাতুল বাসেত এবং দুই ছেলে ও এক মেয়ে রেখে গেছেন। আল্লাহ্ তা'লা তার সাথে ক্ষমা ও অনুগ্রহের আচরণ করুন।

পরবর্তী স্মৃতিচারণ হলো শ্রদ্ধেয়া মাদীহা নাওয়ায সাহেবার, যিনি ঘানার মুরব্বী সিলসিলা নাওয়ায আহমদ সাহেবের সহধর্মিণী ছিলেন। গত ১৬ এপ্রিল তারিখে ৩৬ বছর বয়সে তিনি পরলোক গমন করেন, **ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন'** । তিনি ঘানাতেই ছিলেন এবং সেখানেই তার মৃত্যু হয়। মুরব্বি সাহেব অর্থাৎ তার স্বামী লিখেন যে, ১৬ বছরের বিবাহিত জীবনে আমি তাকে অগণিত গুণের আধার হিসেবে পেয়েছি। খুবই সাহসী, ধৈর্যশীলা, দয়ার্দ্র ও নিঃস্বার্থ এক নারী ছিলেন। অতি উত্তম মা ও বিশ্বস্ত সহধর্মিণী ছিলেন। ঘানায় যেখানেই সুযোগ পেতেন, ছোট শিশুদের ক্লাস নিতেন। নিজের সন্তানদের সাথে বসিয়ে কুরআন পড়াতেন। শ্বশুরবাড়ির আত্মীয়স্বজনদের সাথে সদ্ব্যবহার করতেন এবং কখনো কারো কঠোর আচরণের পাল্টা জবাব দিতেন না, বরং নিজে সহ্য করতেন এবং আমাকেও (অর্থাৎ তার স্বামীকেও) সহ্য করতে বলতেন। সার্বক্ষণিক দোয়া করার কথা স্মরণ করাতেন। সন্তানদের তরবীয়তের ব্যাপারে ছোট ছোট বিষয়ের প্রতি তিনি যত্নবান ছিলেন। খিলাফতের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের গুরুত্ব বোঝানোর জন্য বেশিরভাগ সময়ই সন্তানদেরকে খিলাফতের কল্যাণরাজির বিষয়ে উল্লেখ করতেন। দরিদ্রদের প্রতি অনুগ্রহশীল এক পবিত্রাত্মা নারী ছিলেন। তিনি শোকসন্তপ্ত পরিবারে স্বামী ছাড়াও তিন সন্তান রেখে গেছেন, যথা ফুরাদ সাফীহ বয়স ১৩ বছর, ফ্যায়যিয়া, বয়স ৮ বছর এবং যারা, বয়স ১ বছর। মাশা'আল্লাহ্ সব সন্তানই ওয়াকফে-নও স্কীমের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমার দোয়া তার সন্তানদের পক্ষে গ্রহণ করুন এবং তার মর্যাদা উন্নীত করুন আর তার সাথে ক্ষমা ও অনুগ্রহের আচরণ করুন।(আমীন)

****

নিকাহ্‌র জন্য ওলীর অনুমতি অনিবার্য

সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.) খুতবা জুমআ প্রদত্ত ৮ই এপ্রিল ২০১৬ তারিখে বলেন-

" বিবাহ সম্পর্কে এই বিষয়টি মেয়েদের জন্যও স্পষ্ট হওয়া জরুরী যে, যদিও সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে মেয়ের পছন্দকেও স্থান দেওয়া উচিত এবং মহানবী (সা.) মেয়ের পছন্দকে মর্যাদা দিয়েছেন, কিন্তু ইসলাম এ বিষয়টিকেও মেনে চলতে বাধ্য করে যে, ওলীর অনুমতি ব্যতীত নিকাহ্ বৈধ নয়।

হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) বলেন- " আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ মওউদ (আ.) কে প্রেরণ করেছেন এবং প্রকৃতপক্ষে তিনি তাঁর পক্ষ থেকেই। আমাদের শরীয়ত বলে (অর্থাৎ ইসলামের শরীয়ত একথাই বলে) যে, কিছু ক্ষেত্রে শরিয়ত নির্ধারিত ব্যতিক্রম ছাড়া ওলীর অনুমতি ব্যতিরেকে কোন নিকাহ বৈধ নয়। যদি এমন কোন নিকাহ হয়ে থাকে তা অবৈধ ও অসম্পূর্ণ বলে গণ্য হবে। এমন মানুষদেরকে বোঝানো আমদের কর্তব্য। যদি তারা না বোঝে তবে তাদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করুন।"

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর যুগেও অনেক সময় এধরণের ঘটনা ঘটেছে। এক যুবতী এক ব্যক্তির সঙ্গে বিবাহ করার বাসনা করে, কিন্তু তার পিতা অস্বীকৃতি জানায়। তারা দুজনে (কাদিয়ান নিকটস্থ স্থান) নঙ্গল এসে কোন মোল্লার কাছে নিকাহ পড়িয়ে নেয় এবং তাদের বিয়ে হয়ে গেছে বলে প্রচার করে বেড়ায়। এরপর তারা কাদিয়ান আসে। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এ সংবাদ প্রাপ্ত হলে তাদের উভয়কে কাদিয়ান থেকে বহিষ্কার করেন এবং বলেন কেবল মেয়ের সম্মতি নিয়ে ওলীর অনুমতি ছাড়া নিকাহ পড়ানো শরীয়ত বহির্ভূত কর্ম। সেখানেও মেয়ে সম্মত ছিল এবং বলছিল যে, এই যুবকের সঙ্গে বিয়ে করব, কিন্তু তারা যেহেতু ওলীর অনুমতি ছাড়া নিকাহ পড়িয়েছিল এই কারণে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) তাদেরকে কাদিয়ান থেকে বের করে দিয়েছিলেন। অনুরূপভাবে (কাদিয়ানে সেই যুগে হযরত মুসলেহ মওউদ-এর যুগেও এমন একটি নিকাহ পড়ানো হয়েছিল। তিনি বলেন) এই নিকাহটিও অবৈধ। তার মা-কেও আমি একথাই বলেছি। (ছেলের মাকে বলেছিল। একজন মহিলা এসে বলছিল যে, যেহেতু মেয়ে রাজি ছিল তাই আমার ছেলে নিকাহ করেছে। এতে কিসের এত বিপত্তি?) তিনি (রা.) বলেন, আমি তাকে বলেছি যে, তুমি তোমার ছেলের জন্য পাত্রী পেয়েছ তাই বলছ যে, মেয়ে যেহেতু রাজি আছে তবে ওলীর সম্মতির প্রয়োজন কি? কিন্তু তোমারও তো মেয়ে আছে। যদি তাদের বিয়ে হয়ে থাকে তবে তাদেরও হয়তো মেয়ে আছে। তাদের মধ্য থেকে কোন মেয়ে এরকমভাবে কোন পর পুরুষের সাথে ঘর থেকে বেরিয়ে যাক- এটি কি তুমি পছন্দ করবে?"

(খুতবাতে মাহমুদ, ১৮তম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১৭৫-১৭৬ থেকে সংকলিত)

অতএব যেরূপ পূর্বেই উল্লেখ হয়েছে যে, পিতা-মাতাকেও কোন বৈধ কারণ ছাড়া মিথ্যা আত্মাভিমানের নামে সম্পর্ক না করার হঠকারিতা দেখানো উচিত নয় যার ফলে হত্যার মত নৃশংস অপরাধ না করে বসে। মেয়েদেরকেও ইসলাম ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে আদালতে বা কোন মৌলবীর কাছে বিয়ে করার বা নিকাহ পড়ানোর অনুমতি দেয় না। যদি কোন বাধ্যবাধকতার পরিস্থিতি দেখা যায় তবে মেয়ে খলীফায়ে ওয়াক্তের কাছে পত্র লিখতে পারে, যিনি পরিস্থিতি অনুসারে সিদ্ধান্ত প্রদান করবেন। অতএব ছেলে ও মেয়ে উভয়ই যদি ধর্মকে জাগতিকতার উপর প্রাধান্য দেওয়ার নীতিকে সামনে রাখে তবে খোদা তা'লাও কৃপা করবেন।"

****

এর আগে যদিও এখানে একটি সেন্টার ছিল, কিন্তু এখন সেটিকে মসজিদের রূপ দেওয়া হয়েছে, সচরাচর যেমনটি মুসলমানদের মসজিদ হয়ে থাকে। মসজিদের উদ্দেশ্য আল্লাহ্ তা'লার ইবাদতের জন্য একস্থানে সমবেত হওয়া। আল্লাহ্ তা'লার প্রকৃত ইবাদতকারী তারাই যারা শুধু ইবাদত করে না, খোদা তা'লার আদেশও মেনে চলে। আল্লাহ্ তা'লার আদেশাবলীর মধ্যে প্রধান আদেশটি হল প্রকৃত ইবাদতকারী সেই ব্যক্তি যে আপন ভাই ও অন্যান্য মানুষের কেবল সেবাই করে না, তাদের আবেগ অনুভূতির প্রতিও যত্নবান থাকে যাতে আমাদের পরিবেশে, আমাদের শহরে এবং সর্বোপরি দেশ ও পৃথিবীতে পারস্পরিক ভালবাসা, ভ্রাতৃত্ববোধ তৈরী হয় এবং শান্তি ও নিরাপত্তার পরিবেশ বজায় থাকে।

এখানে বলা হয়েছে যে জামাত আহমদীয়া মানবতার সেবামূলক কাজ করে। সেই সেবামূলক কাজের কিছুটা বিবরণ দিতে চাই। জামাতের যুবকেরা, যাদেরকে খুদ্দামুল আহমদীয়া বলা হয়, তারা বছরের শুরুতে শহর পরিস্কার করে যাতে নতুন বছরের সূচনায় প্রত্যেক ব্যক্তি, এই শহরের প্রত্যেক নাগরিক, তারা এদেশে বা পৃথিবীর অন্য যে কোন স্থানে বসবাস করুক না কেন- তারা নিজেদের শহরকে যেন পরিস্কার পরিচ্ছন্ন দেখে। জামাত আহমদীয়ার এটি বিশেষ ঐক্যের প্রতীক যে, পৃথিবীর সর্বত্র আমরা যখন কোন কাজ করি- একটি বিশেষ দেশে এক প্রকারের কাজ আবার অন্য কোন দেশে অন্য রকম কাজ-এমন রীতি আমরা অবলম্বন করি না, সর্বত্র একই ধরণের কাজ করে থাকি।পৃথিবীর সর্বত্রই সেবামূলক কাজই আমরা করে থাকি। সাফাই অভিযানের কথা বলতে গেলে এই কাজও সর্বত্র হচ্ছে। মানবতার সেবাও সর্বত্র হচ্ছে। আরও একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ কাজ আছে যা আমরা মানুষকে একে অপরের কাছাকাছি নিয়ে আসার উদ্দেশ্যে করে থাকি। পৃথিবীতে বহু গোষ্ঠী, জাতি ও ধর্ম আছে, আবার যেমন আস্তিক আছে, তেমন নাস্তিকের সংখ্যাও অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। তাদের সকলকে এক স্থানে সমবেত করা, একত্রে রাখা এবং পরস্পরের কাছাকাছি নিয়ে আসাও আমাদের কর্তব্য। এই উদ্দেশ্যে আমরা আন্তঃধর্মীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকি যাতে প্রত্যেকেই নিজের নিজের ধর্মের গুণাবলী ও সৌন্দর্য বর্ণনা করতে পারে।

কিছু দিন আগেই লন্ডনে জামাত আহমদীয়া ব্রিটেন- এর একশ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে সেখানকার একটি প্রাচীন ঐতিহ্যশালী গিল্ড হল-এ একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। যেখানে বিভিন্ন ধর্মের মানুষ আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। ইস্রাইল থেকে 'রাব্বানী' এসেছিলেন, চার্চের পাদ্রীও এসেছিলেন। মধ্যপ্রাচ্যের কিছু প্রাচীন ধর্মের প্রতিনিধি ও রাজনীতিকবর্গও এসেছিলেন। সেখানে আমি ইসলামের শিক্ষামালা বর্ণনা করার সুযোগ পেয়েছিলাম। প্রত্যেক ধর্মের প্রতিনিধি নিজের নিজের ধর্মের শিক্ষা বর্ণনা করেছেন। খুব সুন্দর ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে সেই অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন হয়েছিল। প্রায় এক হাজার অ-মুসলিম অতিথি সেখানে উপস্থিত ছিলেন, যারা ধৈর্যসহকারে সমস্ত কথা শুনেছেন। পৃথিবীর সর্বত্রই আন্তঃধর্মীয় অনুষ্ঠানের আয়োজনে জামাত আহমদীয়া গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে, যাতে পরস্পরকে বোঝার জন্য একটা সুস্থ পরিবেশ পাওয়া যায়। ধর্ম হল প্রত্যেকের ব্যক্তি পরিসরের বিষয়। আর কুরআন করীম দাবি করে, ধর্মের বিষয়ে কোন বলপ্রয়োগ নেই। যেখানে বলপ্রয়োগ নেই, সেখানে কারো বিরুদ্ধে বিদ্বেষ পোষণ করার আমাদের কোন অধিকার নেই। আমি যে জিনিসটিকে ভাল মনে করি তা গ্রহণ করার অধিকার আমার আছে। আপনাদের মধ্যে যারাই এই ধর্মটিকে উত্তম মনে করে, তাদের অধিকার আছে এটি গ্রহণ করার এবং তা অপরের সামনে বর্ণনা করার। কাজেই মানুষের মধ্যে যখন এমন চিন্তাধারার জন্ম নেয়, তখন মানুষ মানবীয় মূল্যবোধের প্রতি মনোযোগি হয়, অপরের ক্ষতি করার বিষয়ে নয়। আর মানুষ হওয়ার দরুন আমরা পরস্পর ভাইভাই-এটিই তো মানবীয় মূল্যবোধ। একে অপরের সঙ্গে সুসম্পর্ক থাকা বাঞ্ছনীয়। প্রতিবেশী হল মানুষের সব থেকে কাছের মানুষ। এই দৃষ্টিকোণ থেকে আমি প্রতিবেশীদেরকেও ধন্যবাদ জানাই যে এখানকার আগেকার সেন্টারটিকে মসজিদে রূপান্তরিত করা সম্ভবই হত না, যদি না প্রতিবেশিরা সহযোগিতা করতেন। ইসলামের প্রবর্তক মহানবী (সা.) বলেছেন, আল্লাহ্ তা'লা আমাকে প্রতিবেশীদের অধিকারের বিষয়ে এতবেশি জোর দিয়েছেন যে, আমার মনে এই ধারণার উদ্রেক হয়েছে, প্রতিবেশীদেরকেও হয়তো উত্তরাধিকার পাওয়ার যোগ্য বলে ধরা হবে। কাজেই আমাদের নিকট প্রতিবেশীদের মর্যাদা এত উচ্চ যে, তার জন্য অনেক বেশি অধিকার নির্ধারিত আছে, যেমন কোন আত্মীয় বা প্রিয়জনের অধিকার রয়েছে, সেভাবে তাদের অধিকার সংরক্ষিত রাখলে এবং তাদের অধিকার উপলব্ধি করলে কোন প্রতিবেশীর কষ্টের কারণ হওয়া সম্ভবই নয়। প্রতিবেশীর দুঃখ কষ্ট দূর করাই আমাদের কর্তব্য। আমাকে জানানো হয়েছে এছাড়া এখানে একজন বক্তাও একথা উল্লেখ করেছেন যে আমাদের সম্পর্কে যাদের ভ্রান্ত ধারণা রয়েছে, তারা আমাদের বিরুদ্ধে মিছিল বের করছে, বিক্ষোভ প্রদর্শন করছে,অল্প হলেও। কাল পরশুর কথা, আমাদের কিছু শুভাকাঙ্খীরাও এই মর্মে বার্তা পাঠিয়েছে, 'আমরা আপনাদের সঙ্গে আছি।' অর্থাৎ স্থানীয়দের মধ্যে যারা মুসলমান নয়, তারা আমাদের বলেছে, আমরা আপনাদের সঙ্গে আছি, আপনারা যদি তাদের মিছিলের প্রতিবাদে মিছিল বের করতে চান, তবে আমাদেরকেও সঙ্গে পাবেন।' আমাদের ন্যাশনাল আমীর সাহেব উত্তর দিয়েছেন, 'আমরা এই ধরণের প্রতিবাদ মিছিল বের করি না।' তারা আমাকে এবিষয়ে জানালে আমি বললাম, 'আপনার উত্তর দেওয়া উচিত ছিল, আমরা আপনাদের কথা মত প্রতিবাদ মিছিল বের করব, কিন্তু আমাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ স্বরূপ যে যে স্থান দিয়ে মিছিল নিয়ে যায় বা যেখানে আমাদের মসজিদ আছে, সেই পরিবেশে আমরা যুবকদের হাতে ব্যানার দিয়ে দাঁড় করিয়ে দিব, যাতে লেখা থাকবে, 'ভালবাসা সকলের তরে, ঘৃণা নয়কো কারো পরে।' আর এটিই আমাদের প্রত্যুত্তর, তাদের বোঝানোর জন্য এটিই আমাদের বিক্ষোভ প্রদর্শন। যারা মনে করে ইসলাম হয়তো কঠোরতার ধর্ম, চরমপন্থার ধর্ম, এখন এখানে মসজিদ তৈরী হয়েছে, জানি না কি কি বিশৃঙ্খলা দেখা দিবে- তারা যখন আমাদের পক্ষ থেকে এই উত্তর পাবে, তখন নিজেরাই উপলব্ধি করবে যে তারা আমাদেরকে ভুল বুঝেছিল। জামাত আহমদীয়ার প্রবর্তক হযরত মসীহ মওউদ (আ.) তাঁর একটি কবিতায় বলেছেন-

'গালিয়াঁ শুনকে দোয়া দো
পাকে দুখ আরাম দো/ কিবর কি
আদত জো দেখো তুম দিখাও
ইনকিসার।'

অর্থাৎ- গালি শুনে দোয়া দাও, দুঃখ পেয়ে সুখ দাও/ যেখানেই অহংকার দেখ তুমি বিনয় প্রদর্শন কর।'

তাই আমাদের শিক্ষা হল কেউ আমাদেরকে গালি দিলেও আমরা তার জন্য দোয়া করি, কেউ দুঃখ দিলেও তাকে সুখ দিই, কেউ আমাদের সামনে অহংকার প্রদর্শন করলে তার সামনে আমরা বিনীত হই। যেমনটি আমি বলেছি, এখানে আগেও সেন্টার ছিল, এখন মসজিদের মিনার তৈরী হয়েছে। তাই যে ভালবাসার বহিঃপ্রকাশের কথা আমি উল্লেখ করেছি, তা এখানকার আহমদীদের পক্ষ থেকে আরও বেশি হবে আর আপনারা এর সাক্ষী থাকবেন এবং অনুভব করবেন।'

হুযুর আনোয়ার বলেন, যাইহোক এটা আপনাদের পক্ষ সহানুভূতিপূর্ণ আবেগের বহিঃপ্রকাশ আর এখানকার স্থানীয় মানুষেরা যে ন্যায়সঙ্গত বিষয়ের জন্য আহমদীদের সঙ্গে আছেন- আমাদের মাঝে এমন নিরাপত্তাবোধ তৈরী করা আপনাদের উচ্চ নৈতিকতার পরিচায়ক। আর মিনার তৈরী করার অনুমতি দেওয়ার জন্য আমি মেয়র সাহেব সহ প্রতিবেশী এবং কাউন্সিলর সকলকে ধন্যবাদ জানাই। যেমনটি আমি পূর্বেও উল্লেখ করেছি, আমাদের আদর্শবাণী হল, 'ভালবাসা সকলের তরে,ঘৃণা নয়কো কারো পরে।' এ বিষয়টি সর্বত্র প্রচার করা উচিত। আর কোন প্রতিবাদ বা

মহানবী (সা.)-এর বাণী

আঁ হযরত (সা.) বলেছেন: যে ব্যক্তি কুরআন পাঠ করে এবং তা হৃদয়াঙ্গম করে সে ধনী, তার কোনও প্রকার দারিদ্রের আশঙ্কা নেই।

(সুনান সঈদ বিন মনসুর)

দোয়াপ্রার্থী: Golam Mustafa and family, Berhampore, Dist-Murshidabad

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

তোমাদের মধ্যে সে-ই অধিক মহৎ, যে আপন ভাইয়ের অপরাধ অধিক ক্ষমা করে এবং হতভাগ্য সে, যে হঠকারিতা করিয়া ক্ষমা করে না।

(কিশতিয়ে নূহ, পৃ: ২৫)

দোয়াপ্রার্থী: Abdus Salam, Nararvita (Assam)

বিক্ষোভের জবাবে এটিই আমাদের প্রতিবাদ। এরপর বলা হয়েছে যে ৯/১১ এর পর এখানে 'Love for all, Hatred for none' লেখা ব্যানার ঝোলানো হয়েছে। মসজিদের বাইরে ঝোলানো এই ব্যানার শুধু দেখানোর জন্য নয়, এটি সেই কর্মপন্থা যা প্রত্যেক আহমদীর নিকট প্রত্যাশা করা হয় আর প্রত্যেক আহমদীর পক্ষ থেকে এর বহিঃপ্রকাশ হওয়া চাই। মসজিদ তৈরী হওয়া এবং মিনার তৈরী হওয়ার পর এবং ভবনটি মসজিদে রূপান্তরিত হওয়ার পর এর বহিঃপ্রকাশ আরও বেশি করে ঘটবে। ইনশাআল্লাহ।

হুযুর আনোয়ার বলেন, 'মসজিদ তৈরীর উদ্দেশ্য হল আল্লাহ্ তা'লার উপাসনা করা এবং মানবতার সেবা করা, যেমনটি আমি পূর্বেও বর্ণনা করেছি। তাই মসজিদের মধ্যে যদি পরিকল্পনা রচনা করি বা আহমদীরা করে তবে সেই পরিকল্পনা হল কিভাবে আমরা মানবতার সেবা করব, কিভাবে অন্যের উপকারে আসব এবং তাদের দুঃখ কষ্ট দূর করব। কাজেই প্রত্যেক আহমদী এই চেতনা নিয়ে আপনাদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে। আর পৃথিবীতে বসবাসকারী প্রত্যেক আহমদী এই চেতনা নিয়ে নিজ প্রতিবেশীর অধিকার প্রদানে সচেষ্ট হয় যে, তার সকল দুঃখ কষ্ট দূর করবে। মিনার তৈরীর পর কিছু মানুষের মনে শঙ্কা দেখা দিয়েছে, তারা প্রতিবাদের পথ নিয়েছে। যেমনটি আমি বলেছি, মিনার তৈরীর পর 'ভালবাসা সকলের তরে, ঘৃণা নয়কো কারো পরে' ধ্বনি আরও বেশি করে উচ্চকিত হবে। বিশ্বের অরাজকতাপূর্ণ অবস্থার প্রতি আমরা যখন দৃষ্টিপাত করি, তখন দেখতে পাই, পৃথিবীতে সর্বত্র বিশৃঙ্খলা ও অশান্তি বিরাজ করছে। এমতাবস্থায় পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা আবশ্যক, প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে শান্তির চেতনা তৈরী করা জরুরী। এর জন্য সর্বোত্তম পন্থা হল পরস্পরের সঙ্গে ওঠাবসা করা, আলাপ করা, পরস্পরকে বোঝা এবং উদার মনে একে অপরের চিন্তাধারা শোনা।

হুযুর আনোয়ার বলেন, ইন্টিগ্রেশন নিয়ে এখানে কথা হয়েছে, আমাদের এক সম্মানীয় অতিথি একথার উল্লেখ করেছেন। ইন্টিগ্রেশন একটি জটিল বিষয়, ধীর গতিতে এর সমাধান হবে। কিন্তু ইন্টিগ্রেশনের পরিভাষা নির্ধারণের ক্ষেত্রে আমার জন্য কোন সমস্যা বা জটিলতা নেই। আমি মনে করি, প্রত্যেক সেই ব্যক্তি যে অন্য কোনও দেশে গিয়ে বসবাস শুরু করে, তার কর্তব্য হল সেই দেশকে ভালবাসা, আর তার বিরুদ্ধে মনের মধ্যে কোন প্রকার আবেগ যেন ক্রিয়াশীল না থাকে। সেখানকার স্থানীয়দের সঙ্গে যেন মিলেমিশে থাকে, আর তাদের উন্নতি ও সমৃদ্ধির জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করে। এছাড়া শহরের উন্নতির জন্য, দেশের উন্নতির জন্য নিজের যাবতীয় শক্তি-সামর্থ যেন প্রয়োগ করে। বহিরাগতরা যদি এই চিন্তাধারা নিয়ে স্থানীয়দের সঙ্গে মিলেমিশে থাকে, দেশের উন্নতির জন্য কাজ করে, শান্তি ও সম্প্রীতির জন্য কাজ করে, তবে এর থেকে বড় ইন্টিগ্রেশন আর কি হতে পারে? আর এটিই মানুষের একত্রে থাকার উদ্দেশ্য। কাজেই এটি খুব বড় কোন সমস্যা নয়।

হুযুর আনোয়ার বলেন: যেমনটি আমি পূর্বে উল্লেখ করেছি আর বক্তাগণও বলেছেন যে ধর্ম মানুষের অন্তরের বিষয়। কিন্তু যে মানবীয় মূল্যবোধের বিষয়টি রয়েছে তা প্রত্যেক ধর্মের অনুসারীকে সনাক্ত করা আবশ্যক। আর ধর্ম নির্বিশেষে আমাদেরকে মানবীয় মূল্যবোধের বিষয়ে যত্নবান হতে হবে। এই জিনিসটি তৈরী হয়ে গেলে পৃথিবীতে শান্তি ও সম্প্রীতির পরিবেশ প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। কাজেই এই বিষয়টির দিকে আমাদের মনোযোগ দিতে হবে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: আমাদের শেষ বক্তা আরও একটি কথার উল্লেখ করে গিয়েছেন। তিনি বলেছেন, পাকিস্তানে আমাদের অনেক বিরোধিতা হয়। সেখানে আমাদের সংখ্যা বিশাল হওয়া সত্ত্বেও খুব বেশি বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। শহীদও করে দেওয়া হয়, নির্যাতনও করা হয়, জেলে পোরা হয়, কিন্তু আমরা কখনও এর প্রতিবাদ করি নি। তবে আইনী পথে যতদূর সম্ভব এগিয়ে গিয়েছি। সম্প্রতি আমাদের এক খ্যাতনামা চিকিৎসককে গুলি করে শহীদ করে দেওয়া হয়েছে। তিনি যুক্তরাষ্ট্রে একজন হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। সেবামূলক কাজে তিনি পাকিস্তানে গিয়েছিলেন। সেখানে রাবোয়া নামক ছোট্ট একটি শহর আছে, যেখানে আহমদীদের সংখ্যা অনেক বেশি। সেখানে আমাদের বড় হাসপাতাল রয়েছে, তাই তিনি চিকিৎ করতে পৌঁছেছিলেন। এই হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য আসা ৮০ শতাংশ রুগীই অ-আহমদী। যাইহোক তিনি যুক্তরাষ্ট্র থেকে সেবার উদ্দেশ্যে সেখানে এসেছিলেন। কিন্তু পরের দিনই দুষ্কৃতিদের গুলিতে শহীদ হয়ে যান। তাঁর জানাযা কানাডা পাঠানো হয়, আর সেখানে কানাডা ও যুক্তরাষ্ট্র সরকার তাঁকে অনেক সম্মান দিয়ে শেষকৃত্য সম্পন্ন করেছে। উভয় দেশের সরকার তাদের দেশের জাতীয় পতাকায় মুড়ে তাঁর কফিন দফন করেছে। এমন পর্যায়ের ডাক্তার ছিলেন তিনি, যাকে একাধিক পুরস্কারও দেওয়া হয়েছিল। তাঁর মধ্যে যে সেবার মনোবৃত্তি ছিল তার কারণে তিনি এত সব পুরস্কার পাওয়ার পরও কখনও বলেন নি যে আমি বড় হাসপাতালে কাজ করব, মানবতার সেবার জন্য ছোট্ট একটি জায়গায় এলেন আর শহীদ হয়ে গেলেন। কিন্তু তবু আমরা সেখানে কোন বিক্ষোভ বা প্রতিবাদ করি নি। অথচ মানুষের সেবা করার স্পৃহাও আমাদের মধ্যে হ্রাস পায় নি। আমরা এখনও তাদের সেবা করছি আর ভবিষ্যতেও করে যাব।

হুযুর আনোয়ার বলেন: জামাতের সেবামূলক কাজের প্রসঙ্গে একজন বক্তা সিরালিওন-এর কথা বললেন। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় আফ্রিকার এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আমাদের স্কুল ও হাসপাতাল চলছে আর মানবতার সেবাও আমরা করছি। অতএব যে সব স্থানে আহমদীরা আছে আর যেখানে মসজিদ তৈরী করি, সেখানে পাশাপাশি এও চেষ্টা করি যেন মানবতার সেবামূলক কাজগুলি আরও বিস্তৃতি লাভ করে। আর এই কারণেই আফ্রিকায় যে আমাদের বেশি মসজিদ তৈরী হচ্ছে, সেখানে আমাদের স্কুল ও হাসপাতালও সেবার মানসিকতা নিয়ে কাজ করছে। কাজেই মানবতার সেবার জন্য আমাদের মাঝে এক প্রকার স্পৃহা রয়েছে। মসজিদ প্রসঙ্গে আমি পুনরায় বলব যে, মসজিদ তৈরী হওয়াতে অনেকের মনে শঙ্কা তৈরী হয়। যদি কোন ভ্রান্ত ধারণা থাকে তবে তা দূর করুন। কেননা আমাদের এই মসজিদ স্থানীয় লোকদের ইবাদতের জন্য স্থান সংকুলান করার মাধ্যমে তাদেরকে খোদার প্রতি আনত করবে এবং করা উচিত। আর প্রত্যেক আহমদীর একথা স্মরণ রাখা উচিত যে সেখানে মানবতার সেবার স্পৃহার বহিঃপ্রকাশ পূর্বের চেয়ে বেশি ঘটবে। ইনশাআল্লাহ্ তা'লা আমরা এখানকার স্থানীয় মানুষদের সেবার জন্যও পূর্বাপেক্ষা উত্তম পরিকল্পনা তৈরী করব। জাযাকুমুল্লাহ্ । ধন্যবাদ।

হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর ভাষণ ৭:০৫টায় সমাপ্ত হয়। সব শেষে তিনি দোয়া করেন।

অতিথিদের প্রতিক্রিয়া

একজন সাংবাদিক বলেন, খলীফাতুল মসীহ শান্তির যে বার্তা দিয়েছেন তা তাঁর সমগ্র সত্তা থেকে ফুটে উঠছিল আর গোটা হলঘরে এর প্রভাব পড়েছে,যেখানে কেবল শান্তি বিরাজ করছিল।

একজন মহিলা সাংবাদিক বলেন: খলীফার চেহারায় আমি জ্যোতি দেখেছি। তিনি নীরব থাকলেও সারা দিন তাঁকে দেখতে ইচ্ছে করে। মানুষ তাঁকে অবাক দৃষ্টিতে দেখতেই থাকে।

এক ভদ্রমহিলা বলেন, খলীফাতুল মসীহ যখন তাঁর ভাষণে ডাক্তার সাহেবের শাহাদতের ঘটনা উল্লেখ করলেন, তখন আমি তা নিজেকে সংবরণ করতে পারি নি, কাঁদতে শুরু করেছিলাম। এরপর তিনি যখন বললেন, এই শাহাদত সত্ত্বেও আমাদের সেবার প্রেরণায় ভাটা পড়ে না, আমরা সেবা চালিয়ে যাব, তখন আমার পক্ষে ভাবাবেগ নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন হয়ে পড়েছিল।

একজন অতিথি বলেন, হুযুরের সঙ্গে আমার খুব সুন্দর কথা হয়েছে। তাঁর সত্তা থেকে আধ্যাত্মিকতা যেন চুঁইয়ে পড়ছিল। আমি তাঁকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেছি। আমার মতে নিউফহার্ন শহরের অপরের সঙ্গে কথা বলার জন্য উদার মন রয়েছে। মসজিদের মিনার এই বিষয়ের প্রতীক যে জামাত এখানে নিজেকে একীভূত করে ফেলেছে। হুযুর আনোয়ার একজন আধ্যাত্মিক সত্তা, যাঁর কাছে ধর্মীয় জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা উভয়ই আছে। যেভাবে জামাতের মানুষ হুযুরের আগমণে আনন্দিত, তা থেকে বোঝা যায় যে তিনি একজন সম্মানীয় ব্যক্তি আর পৃথিবীতে এক বিরাট দায়িত্ব পালন করছেন।

এক ভদ্রলোক বলেন: হুযুর আনোয়ার এমন এক জামাতের নেতা যারা আমার অন্তরে স্থান করে নিয়েছে। জাতিসংঘের পক্ষ থেকে ধর্মীয় স্বাধীনতার বিশেষ সাংবাদিক হিসেবে আমার কাজ হল যেখানেই কোনও ধর্মীয় সম্প্রদায়ের অধিকার হরণ হতে দেখব, জাতিসংঘকে অবগত করব। জামাত আহমদীয়ার বিরোধিতা হচ্ছে। বিশেষ করে পাকিস্তানে, যেখানে আহমদীদের হত্যা করা হচ্ছে, তাদের বিরুদ্ধে মানুষকে উত্তেজিত করে তোলা হচ্ছে। এখন তো আমাদের কোন মিটিংই জামা০তের কথা উল্লেখ ছাড়া সম্পূর্ণ হয় না।

(ক্রমশ....)

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2020 -2022 Vol. 6 Thursday, 1 July, 2021 Issue No.27

MANAGER
SHAIKH MUJAHID AHMAD
Mob: +91 9915379255
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs.575/- (Per Issue : Rs. 9/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

এই আয়াতের দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যেতে পারে যে ভারতের ভবিষ্যতের ভাষা হবে উর্দু, অন্য কোন ভাষা এর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দাঁড়াতে পারবে না।

সৈয়্যদানা হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) সূরা ইব্রাহিমের ৫ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন:

অনেকে 'ইল্লা বি লিসানি কাউমিহি'-র অর্থ করেছে, 'রসুলের প্রতি ওহী কেবল সেই জাতির ভাষাতেই হওয়া বাঞ্ছনীয়। কিন্তু এটি সঠিক নয়। তবে একথা ঠিক যে সেই জাতির ভাষাতে অবশ্যই ওহী হওয়া উচিত, কেননা যে বার্তা জাতির কাছে পোঁছাতে হবে তা যদি অন্য কোন ভাষায় হয়, তবে সেই প্রচারের ক্ষেত্রে জটিলতা সৃষ্টি হবে। কিন্তু অলৌকিক নিদর্শন হিসেবে অন্য কোন ভাষাতে ইলহাম হলে তাতে কোন অসুবিধে নেই।

অনেকে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর ইলহামের বিষয়ে এই আয়াতটি উপস্থাপন করার মাধ্যমে আপত্তি করে। অথচ আরবী এবং উর্দু ছাড়া অন্য যে যে ভাষায় তাঁর উপর ইলহাম হয়েছে সেগুলি সবই ছিল নিদর্শন হিসেবে। আরবীতে তাঁর উপর ইলহাম হয় যে এটি ইসলামের ধর্মীয় ভাষা। এইরূপে এটি মুসলমানদের জাতীয় ভাষা। আর উর্দুতে এজন্য করা হয়েছে যে যাদের উদ্দেশ্যে এই বাণী এসেছিল তারা উর্দুভাষী ছিল। আর দেখতে গেলে তাঁর ইলহামসমূহের প্রধান অংশগুলি হয়তো আরবী কিম্বা উর্দুতে রয়েছে। অন্যান্য ভাষায় যে ইলহাম হয়েছে, এমন না যে সেগুলিকে বাদ দিলে তবলীগের ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি হত,সেগুলি কেবল অতিরিক্ত সমর্থন ও নিদর্শন হিসেবে ছিল।

খৃষ্টানরা, বিশেষ করে ভ্যারি এই আয়াত দ্বারা রসুল করীম (সা.)-এর উপর আপত্তি উত্থাপন করেছে। ভ্যারি সাহেবের দাবি, এই আয়াত থেকে জানা যায় যে মহম্মদ রসুলুল্লাহ্ (সা.) শুধুমাত্র আরবদের জন্য ছিলেন। সেই সঙ্গে তিনি এও লিখেছেন যে, এই আয়াত থেকে প্রমাণিত হয়, কুরআন করীমের অনুবাদ করা বৈধ। তাঁর দুটি বয়ানই পরস্পরের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। যদি নবী করীম (সা.) শুধু আরবদের জন্য ছিলেন তবে অনুবাদের প্রাসঙ্গিকতাই বা থাকল কি ভাবে? যেহেতু অন্য কোন জাতির সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক নেই, অতএব, অনুবাদের প্রয়োজনও থাকল না। আর যদি এর অনুবাদ করা বৈধ প্রমাণিত হয় তবে জানা গেল তারা নবুয়্যত অন্যান্য জাতির জন্যও ছিল। এই প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর হল এই আয়াতের অর্থ মোটেই এই নয় যে আঁ হযরত (সা.) শুধু আরবদের জন্য রসুল, কেননা কুরআন করীমের অন্যান্য স্থান থেকে স্পষ্ট প্রমাণ হয় যে তিনি সমগ্র জগতের জন্য আবির্ভূত হয়েছিলেন।

এই আয়াত থেকে এও জানা যায় যে, আরবী 'উম্মুল আলসিনা' (সমস্ত ভাষার জননী), কেননা যে রসূল আরবের বুকে আবির্ভূত হলেন, তাঁর কাঁধেই সমগ্র জগতের সংশোধনের ভার দায়িত্ব দেওয়া হল। কাজেই আরবীতে নাযেল হওয়া ওহী সমগ্র জগতের জন্য হেদায়াত হিসেবে আখ্যায়িত করায় একথা প্রমাণ হয় যে আরবী কোন না কোন ভাবে সমস্ত ভাষার জননী। আর অন্যান্য ভাষাগুলি আরবীর কন্যা সন্তান সদৃশ।

এই আয়াতে আর্যদের এই আপত্তির খণ্ডন করা হয়েছে যে, ঐশী বাণী এমন ভাষায় অবতীর্ণ হওয়া বাঞ্ছনীয় যে ভাষায় কেউ কথা বলে না, যাতে সকলের মধ্যে সাম্য বজায় থাকে । কিন্তু কুরআন করীমের দাবি, এমন ভাষায় ওহী হওয়া উচিত যে ভাষায় মানুষ কথা বলে, যাতে নবী তাদেরকে বোঝাতে পারেন আর তারাও বুঝতে পারে। যে ভাষা পৃথিবীর মানুষ বলেও না কিম্বা বোঝেও না, সেই ভাষায় ঐশী বাণী হওয়ার উপযোগিতা কি থাকল? আর্যদের এই মতবাদ এভাবেও ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়। যখন বেদ নাযেল হল, যদি সেই সময় ঋষিরা সেগুলি না বুঝে থাকে, তবে সেগুলি নাযেল হওয়া অনর্থক হয়ে দাঁড়ায়। আর যদি তাদেরকে বেদ বুঝিয়ে দেওয়া হয়ে থাকে, সেক্ষেত্রে আর সাম্যই বা কোথায় থাকল? আর যদি সেই সময় আরও অন্যান্য মানুষ ছিল যাদেরকে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছিল, তবে যদিও সেই যুগের লোকদের জন্য সাম্য হল,কিন্তু যারা পরবর্তী যুগে জন্মগ্রহণ করল, তাদের প্রতি সাম্য কিভাবে হল? এখন তো পুরোহিতরা পর্যন্ত বেদের ভাষা সম্পর্কে অনভিজ্ঞ।

যেহেতু এই যুগের প্রত্যাদিষ্ট পুরুষ হযরত মসীহ মওউদ (আ.)এর উপর আরবীর পর উর্দুতে বেশি আধিক্যের সঙ্গে ইলহাম হয়েছে। তাই আমি মনে করি, এই আয়াতের দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যেতে পারে যে ভারতের ভবিষ্যতের ভাষা হবে উর্দু, অন্য কোন ভাষা এর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দাঁড়াতে পারবে না।

'লিইউবাইয়েনা লাহুম' -এর পর 'ইউযেল্লুল্লাহু' ব্যবহারে মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লা এই ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, যদি বোধগম্যের সমস্ত উপকরণ না থাকে, তবে আল্লাহ্ তা'লা পথভ্রষ্ট আখ্যায়িত করেন না। কোন অভিযোগ তখনই দেওয়া হয়, যখন আগে থেকে বোঝানোর কাজ হয়ে যায়। অর্থাৎ একমাত্র 'তাবাইয়ানু' এর পরই পথভ্রষ্ট হওয়ার ফতোয়া দেওয়া যেতে পারে। এর থেকে বোঝা যায় গেল , যতক্ষণ পর্যন্ত জাতির নিকট কোন বিষয়ে নিশ্চিত জ্ঞান পোঁছয় না, ততক্ষণ পর্যন্ত তাদেরকে না মানার কারণে শাস্তি দেওয়া যেতে পারে না। এই প্রসঙ্গেই আমি সেই অভিযোগটিও দূর করে দিতে চাই যা গায়ের মোবাইনদের পক্ষ থেকে আমাদের উপর এই মর্মে আরোপ করা হয় যে, আমরা নাকি প্রত্যেক ব্যক্তিকে শাস্তিযোগ্য বলে মনে করি, তার কাছে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর দাবি পোঁছুক না না পোঁছুক। এই অভিযোগ অসত্য। আমরা কিভাবে এমন মতবাদ তৈরী করতে পারি, যখন কিনা কুরআন শরীফে স্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে যে ধ্বংসের ফতোয়া তখনই দেওয়া যায় যখন 'তাবাইয়ানা' সম্পূর্ণ হয়।

'ওয়া হুয়াল আযিযুল হাকীম' তিনি মহাপরাক্রমশালী, শাস্তি দেওয়ার ক্ষমতা রাখেন, কিন্তু মহাপ্রজ্ঞাময়। অতএব,যতক্ষণ শাস্তি দেওয়ার কারণ না থাকে, ততক্ষণ তিনি শাস্তি দেন না।

(তফসীরে কবীর, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৪৪২-৪৪৩)

তাহরীকে জাদীদের চাঁদা দাতাদের উদ্দেশ্যে বিশেষ জ্ঞাপন

যেমনটি জামাতের সদস্যগণ অবগত আছেন যে তাহরীকে জাদীদের নতুন বছরের ছয় মাসেরও বেশি সময় অতিক্রান্ত হয়েছে। কিন্তু যারা চাঁদা দেওয়ার অঙ্গীকার লিখিয়েছিলেন, ওকালত মাল-এর তথ্য অনুযায়ী তাদের অনেকের চাঁদা এখনও অনাদায়ী রয়েছে। ভারতের সমস্ত জেলা স্তরীয় আমীর, স্থানীয় আমীর, জামাতের সদর ও তাহরীকে জাদীদ সেক্রেটারীগণের কাছে আবেদন করা হচ্ছে যে, স্থানীয় মুবাল্লিগ ও মুয়াল্লিমদের সহযোগিতা নিয়ে তাহরীকে জাদীদের চাঁদা আদায় উপলক্ষ্যে 'তাহরীকে জাদীদ মাল-সপ্তাহ' উদযাপন করুন, যাতে সৈয়্যদানা হুযুর আনোয়ারের পক্ষ থেকে পাওয়া লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়, কিম্বা তা ছাপিয়ে যাওয়ার তৌফিক লাভ হয়। আমীন।

সৈয়্যদানা হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) বলেন-"একথা চিন্তা করো না যে তাহরীকে জাদীদ আমার পক্ষ থেকে প্রবর্তিত হয়েছে। না, আমি এর প্রতিটি শব্দ কুরআন করীম থেকে প্রমাণ করতে পারি আর প্রত্যেকটি নির্দেশ রসুলুল্লাহ্ (সা.) এর নির্দেশনামা থেকে দেখাতে পারি। কিন্তু চিন্তাশীল মনন এবং ঈমান আনয়নকারী হৃদয়ের প্রয়োজন। তাই একথা চিন্তা করো না যে যা কিছু আমি বলেছি তা আমার পক্ষ থেকে, এগুলি তাঁর কথা যাঁর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে। যদি আমার মৃত্যুও হয়,তবে তিনি অন্যের মুখ দিয়ে এই একই কথা উচ্চারণ করাবেন আর তার মৃত্যুর অন্য কারো মুখ দিয়ে। তিনি ক্ষান্ত হবেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমাদেরকে এর অধীন না করেন।"

(খুতবা জুমা প্রদত্ত, ১৩ ডিসেম্বর, ১৯৩৫)

আল্লাহ্ তা'লা সকল চাঁদা দাতাদের প্রাণ ও সম্পদে অসামান্য আশিস দান করুন। আমীন। (উকীলুল মাল, তাহরীকে জাদীদ)

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir